সূচীপত্র

হায়াতে ইমাম গাজ্জালী

নাম—ধাম ও পিতৃপরিচয়

যে বিশ্ববরেণ্য মহান ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করছি, তার নাম হল মুহাম্মদ, উপাধী হুজ্জাতুল ইসলাম আর সারা বিশ্বে তিনি প্রখ্যাত হয়েছেন ইমাম গাজ্জালী নামে।

বংশধারা ও পিতৃপরিচয় তাঁর নিম্নরূপঃ তাঁর পিতার নামটিও ছিল নিজের নামের অনুরূপ মুহাম্মদ। মুহাম্মদের পিতা অর্থাৎ ইমাম সাহেবের দাদার নাম ছিল আহমদ।

খোরাসানের একটি জিলার নাম হল তুস। তথাকার দুটো শহর রয়েছে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি তাহেরান আর অপরটি তুকান।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) চারশত পঞ্চাশ হিজরীতে তাহেরান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। গাজল অর্থ সুতা তাঁর পিতা মুহাম্মদ তথাকার একজন বড় সূতা ব্যবসায়ী ছিলেন। নামকরণের এই সামঞ্জস্য তাই তাঁর বংশকে গাজ্জালী আখ্যায় আখ্যায়িত করেছে। কাহারো কাহারো মতে তিনি ছোট বেলায় হরিণের মত চক্ষু বিশিষ্ট অপরূপ সুদর্শন ছিলেন, আর গাজাল অর্থ হলো হরিণ, তাই মাতা পিতা তাঁকে শৈশবে আদর করে গাজালী বলে ডাকতেন। উভয় বর্ণনানুসারে তাঁকে গাজ্জালীও বলা হয় আবার গাজালীও বলা হয়।

শিক্ষা–দীক্ষা

ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) পূর্ব পুরুষেরা ঐতিহ্যগত ব্যবসায়ী হলেও সে বংশের লোকগণ শিক্ষা দীক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন।

ইমাম সাহেব বাল্যে ফিকাহ শাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় জন্মভূমিতেই আহমদ ইবনে মুহাম্মদ জুরজানীর নিকট আরম্ভ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি জুরজান গমন করে ইমাম আবু নছর ইসমাইল (রহঃ)–এর দরবারে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাগ্রহণে আত্মনিয়োগ করেন।

সে যুগে শিক্ষা লাভের একটি প্রচলিত নিয়ম ছিল, উদ্দিষ্ট বিষয়ের উপর ওস্তাদ তাকরীর করতেন এবং শিক্ষার্থীগণ তা সাথে সাথে লিখে ফেলতেন ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতেন এবং সময় সুযোগ মত তা আয়ত্ত করতেন। এই লিখিত এলমী কপিকে তালিকা বলা হত। বলা বাহুল্য ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)–ও এরূপ একখানি তালিকা লিখে ফেলেছিলেন।

ডাকাতের কবলে

কিছুদিন ওস্তাদের দরবারে অবস্থানের পর ইমাম সাহেব যখন স্বীয় গৃহ অভিমুখে রওয়ানা করলেন, পথিমধ্যে একটি ভীষণ দুর্ঘটনার কবলে পতিত হলেন। একদা একদল দুর্ধর্ষ ডাকাত কাফেলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রত্যেকের যথাসর্বস্ব লুন্ঠন করল। ইমাম সাহেবও রেহাই পেলেন না। তার মালামালও সব তারা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সেই সাথে তার লিখিত এলমী কপিটিও হাত ছাড়া হল। হস্তচ্যুত কোন মালামালের জন্যই তিনি মনে কোন দুঃখ অনুভব করলেন না কিন্তু তাঁর তালিকাটি ডাকাতদের হাতে চলে যাওয়ায় তিনি যারপর নাই দুঃখিত এবং ব্যথিত হলেন। ব্যাথাহত হৃদয় নিয়ে অত্যন্তবিষণ্ণ বদনে তিনি তখনি দস্যু সরদারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং বল্লেন.

দেখ সরদার তোমরা আমার যা কিছু নিয়েছ, তাতে কোন দুঃখ নেই। শুধু একটি বস্তু আমি তোমার নিকট ফেরত চাচ্ছি। সেটি তোমাদের কোন কাজে আসবে না। কিন্তু আমার নিকট সেটা অত্যন্ত মূল্যবান। তোমরা আমার যে মালগুলি হস্তগত করেছ, তার মধ্যে আমার একটি লিখিত খাতা রয়েছে। সেটি দয়া করে আমাকে ফিরিয়ে দাও। ওটির দ্বারা তোমাদের কোন উপকার হবে না। তবে আমি ওটা ফিরিয়ে না পেলে আমার এতদিনকার পরিশ্রম বরবাদ হয়ে যাবে, আমি এত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হব যে, তা আর কোনক্রমে পূরণ হবে না।

দস্যু সরদার বল্ল, তুমি বিদেশে কি উদ্দেশ্যে গিয়েছিলে এবং তথায় করেছই বা কি?

ইমাম সাহেব বল্লেন, আমি এলেম শিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়েছিলাম এবং সেখানে শুধু সেকাজেই রত ছিলাম।

দস্যু সরদার বল্ল, তা হলে তো তুমি যথেষ্ট এলেম কালাম শিখে দেশে ফিরছ। তবে একটি মাত্র লিখিত খাতার জন্য এতটা ব্যস্ততা কেন? তোমার ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে যে, লিখা পড়া শিখ নাই কিছুই, বিদ্যা যা কিছু তা তোমার ঐ খাতাটিরই মধ্যে রয়েছে। অথচ বললে যে, এতদিন ধরে শিক্ষালাভে রত ছিলে, ভণ্ড কোথাকার। যাও তোমার এ বিদ্যার ভাণ্ডারটি নিয়ে যাও। এ বলে দস্যু সরদার ইমাম সাহেবের লিখিত খাতাটি তার দিকে ছুড়ে মারল এবং তার দিকে চেয়ে অবজ্ঞার হাসি হাসল। সে হাসি প্রত্যক্ষ করে ইমাম সাহেবের মনে ব্যথা লাগল, দস্যু সরদারের কথাটাও যেন তাঁর কাছে কেমন লাগল। যাই হোক খাতাটি তিনি তুলে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, ওস্তাদ প্রদত্ত শিক্ষার সারমর্ম যা তিনি কপি করে রেখেছিলেন, তা আজ থেকেই তিনি আয়ত্ত্ব করতে শুরু করবেন। বস্তুতঃ গৃহে ফিরে তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিখিত কপির বিষয়গুলি শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং একাধারে তিন বছর ধরে তা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করে ফেললেন।

উচ্চ শিক্ষা লাভ

এর ফলে ইমাম সাহেব শিক্ষালাভের এমন পর্যায়ে উপনীত হলেন যে, সাধারণ আলেমদের পক্ষে তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য ছিল কিন্তু ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) উচ্চ শিক্ষা লাভের পিপাসা কিন্তু এর দ্বারা নিবৃত্ত হল না। সুতরাং তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভের জন্য পুনরায় দেশ ত্যাগের প্রবল বাসনায় উদ্বুদ্ধ হলেন।

সে সময়ে যদিও মুসলিম রাজ্যসমূহের বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত জোরে সোরে শিক্ষা দীক্ষার চর্চা জারী ছিল, কিন্তু এই দিক দিয়ে শীর্ষস্থানীয় ছিল বাগদাদ ও নিশাপুর। সমগ্র বিশ্বে ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল এই শহর দুটি। মুসলিম জগতে তখন সর্বস্বীকৃত দুজন অদ্বিতীয় শিক্ষাগুরু ছিলেন। তাদের একজন আল্লামা আবু ইসহাক সিরাজী (রহঃ)। ইনি বাগদাদ নগরীতে শিক্ষকতা কার্যে রত ছিলেন। আর অন্য ব্যক্তি ছিলেন ইমামুল হারামাইন ইনি অধ্যাপনায় ব্যপৃত ছিলেন নিশাপুরে।

ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) বাসস্থান থেকে নিশাপুর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী ছিল। নিশাপুরে তখন বহু মাদ্রাসা বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সর্বাধিক খ্যাতি সম্পন্ন ছিল নিজামিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ইমামুল হারামাইন উক্ত প্রতিষ্ঠানেরই অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর খাস সাগরেদ রূপে স্থান লাভ করলেন এবং তাঁর কাছ থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে মনোনিবেশ করলেন। শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হয়ে তিনি এত কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হলেন যে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সহপাঠীদের মধ্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র ও শ্রেষ্টত্ব ফুটিয়ে তুললেন। ইমামুল হারামাইনের কাছে তখন চারশ সাগরেদ অধ্যয়নরত ছিল। তন্মধ্যে তিনজন সাগরেদ তাদের প্রতিভা ও সাধনার দ্বারা নিজেদেরকে অন্য সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এরা তিনজন ছাত্র জীবনে শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান বুদ্ধি ও যোগ্যতায় প্রায় সম মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু শিক্ষা জীবন সমাপ্তি পর ইমাম

গাজ্জালী (রহঃ) যে অপূর্ব মর্যাদায় ভূষীত হয়েছিলেন, সত্যি বলতে কি তাঁর ওস্তাদ খোদ ইমামুল হারামাইন (রহঃ) এরও বোধ হয় ততটা নছীব হয়নি।

সমসাময়িক কালে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান কালে মশহুর আলেমদের দরবারে একটি উত্তম ব্যবস্থা গৃহীত হত, তা'হল, ওস্তাদ যখন ছাত্রগণকে কোন নূতন সবক প্রদান করতেন তখন তিনি তা' একবার উত্তমরূপে তাকরীর করে শুনাতেন। অতঃপর শিষ্যদের মধ্যে যে সর্বাধিক যোগ্য বিবেচিত হত, দ্বিতীয়বার তার দ্বারা ঐ সবকটি ভাল ভাবে বুঝিয়ে দেয়া হত। ফলে বিষয়টি সাধারণ অসাধারণ সর্ব শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কাছে সুন্দর রূপে বোধগম্য হয়ে যেত। বিশেষ কঠিন সবকগুলিও এভাবে সবার নিকট সহজবোধ্য হত। যে ভাগ্যবান সাগরেদ এভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে সবক তাকরীর করার নির্দেশ লাভ করত তাকে মুআইয়্যিদ বলা হত। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) স্বীয় প্রতিভা ও যোগ্যতা বলে অনায়াসে এই সম্মানিত পদটি অর্জন করেছিলেন।

শিক্ষার খ্যাতি

যেমন ঘটনা সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না, ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। শিক্ষাগ্রহণ কালেই তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা ও শিক্ষা দীক্ষার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আল্লামা ইবনে খাকান (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তাঁর প্রখ্যাত ওস্তাদ ইমামূল হারামাইন (রহঃ) এর জীবদ্দশাই যথেষ্ট খ্যাতি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া তখনই তিনি একজন উচ্চপর্যায়ের গ্রন্থ রচয়িতা রূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তাঁর গৌরব ও মর্যাদা এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে স্বয়ং ইমামূল হারমাইন (রহঃ) পর্যন্ত স্বীয় সাগরেদের দাবী নিয়ে তাঁর দ্বারা আত্ম-তৃপ্তি লাভ করতেন। অবশ্য ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) যোগ্যতায় এমন পর্যায়ে উপনীত হবার পরেও কিন্তু যতদিন ওস্তাদ ইমামূল হারামাইন জীবিন ছিলেন, ততদিন তাঁর সাথে সম্পর্ক রক্ষায় কোন প্রকারেই শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। বরং তাঁর সাহচর্যকে সযত্নে অক্ষুন্ন রেখেছেন।

নিশাপুর ত্যাগ

আল্লামা ইমামূল হারামাইন (রহঃ) চারশত আটচল্লিশ হিজরীতে পরলোকগমন করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) নিশাপুরের মায়া কাটিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় সম্ভবতঃ সমগ্র মুসলিম জাহানে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী অন্য কেহই ছিলেন না। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র আঠাইশ বৎসর।

সমসাময়িক মুসলিম সাম্রাজ্য

এ সময়ে খেলাফতে বনি আব্বাসের উপরে নানাদিক দিয়ে দুর্যোগের ঘনঘটা ছেয়ে এসেছিল। যার ফলে আব্বাসীয় খলীফাবৃন্দ দুর্বল হয়ে পড়লেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্বাধিকার দাবী ও স্বায়ত্ব শাসনের হাওয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে লাগল। এ ব্যাপারে তুর্কীদের ভূমিকাই ছিল সকলের পুরোভাগে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তুর্কী-বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করল এবং ইসলামী হুকুমতের একটি বিরাট অংশ তুর্কী শাসনের করতলগত হয়ে পড়ল। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর যুগে তুর্কী মুলুকে সালজুক বংশের রাজত্ব চলতেছিল। এই বংশের প্রথম শাসক তুগরল বেগ চারশত উনত্রিশ হিজরীতে সর্বপ্রথম তুস অধিকার করে নেন। তারপর ক্রমে ক্রমে নানাস্থান অধিকার করে চারশত সাতচল্লিশ হিজরীতে ইরাক রাজ্য তুর্কী শাসনভুক্ত করেন।

অতঃপর তাঁর পুত্র আলপে আরসেলান তখতনশীন হন। তাঁর পরলোকগমনের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মালিক শাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। মালিক শাহের শাসনামলেই সালজুকী বংশের গৌরব একে বারে তুঙ্গে পৌছেছিল। মালিক শাহের সাম্রাজ্যের আয়তন

সুবিস্তৃত ছিল। দৈর্ঘ্যে তা ছিল কাশগর থেকে সুদূর চীন সীমান্ত পর্যন্ত আর প্রস্থে ছিল কনষ্টান্টি নোপল থেকে খাসার এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত।

মালিক শাহ অতিশয় দক্ষ এবং সুশাসক ছিলেন। প্রজা হিতৈষীমূলক বহু কার্যই তিনি সম্পন্ন করেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য রাস্তা, ঘাট ও পুল নির্মাণ করে জনসাধারণের যাতায়াত ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। জনসাধারণের উপর থেকে নানা ধরণের টেকস সমূহ মৌকুফ করে দেয়া হয়। রাজ্যের পূর্ববর্তী শাসনপ্রণালীকে সংশোধন ও সুন্দর করে নূতন ছাঁচে ঢালা হয়। দেশের সর্বত্র শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তার বিধান করা হয়।

তবে দেশের এ সকল সুব্যবস্থা ও উত্তম কার্যাবলী যা কিছু করা হয় তা সবই উজীর নেজামুল মূলকের বদ্যেলতে সুসম্পন্ন হয়। নেজামুল মূলকের প্রকৃত নাম ছিল হাসান ইবনে আলী। এ লোকটি ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর জন্মভূমি তুসের অন্তর্গত রাদকানের অধিবাসী ছিলেন। ইনিও একজন উচ্চ পর্যায়ের আলেম, গুণী এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তুর্কী সাম্রাজ্যে তাঁরই প্রচেষ্টায় শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি ও প্রসার লাভ ঘটেছিল। দেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে এখানে সেখানে মক্তব মাদ্রাসা গড়ে তুলেছিলেন। এমন কি ইবনে ওমর উপদ্বীপটি যা দেশের একটি কোণায় অবস্থিত, সেখানে লোকজনের তেমন যাতায়াত ছিল না। তেমনি একটি অখ্যাত স্থানেও তিনি বিরাট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সেরা তর্কবিদ

ইমাম সাহেব নিশাপুর থেকে বিদায় গ্রহণ করে নানাস্থানে ঘুরে ফিরে অবশেষে নিজামুল মুলকের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এ যুগে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পরিপূর্ণতা প্রমাণ করার জন্য এলমী বাহাছ বা বিতর্ক সভার অনুষ্ঠান করা হত। আমীর ওমারা ও রাজা বদশাহদের দরবারে আলেম ফাজেলদের বৈঠক বসত এবং শিক্ষামূলক বিষয়ের উপরে যুক্তি তর্কের দ্বারা

আলাপ আলোচনা চলত। যিনি যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রতিপক্ষকে লাজওয়াব করে দিতে সক্ষম হতেন, তাকেই সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করা হত।

উজীর নিজামুল মুলকের দরবার গৃহ বহুসংখ্যক বিজ্ঞ আলেম এবং সুধীবৃন্দের সার্বক্ষণিক অবস্থান স্থল ছিল। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) সেখানে তাশরীফ নিবার পর নিজামুল মুলক উল্লিখিত সুধীবৃন্দের মধ্যে বিতর্কানুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। পরপর কতগুলি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল ও তাতে বিভিন্ন এলমী বিষয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে যুক্তি-তর্ক সহযোগে সূক্ষ্ম আলাপ-আলোচনা চলল, এর প্রত্যেকটি আলোচনা সভাতেই ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) যোগ্যতার সাথে জয়লাভ করলেন। কোন একটি সভাতেও তাঁর বিপক্ষীয়রা তাঁকে পরাভূত করতে সক্ষম হলেন না। এলমী বাহাছে এরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন ও নিরঙ্কুস বিজয় অর্জন তাঁর সুখ্যাতির মাত্রাকে ব্যাপকতর করে দিল। সারা দেশ জুড়ে তাকে নিয়ে আলাপলোচনা শুরু হয়ে গেল। স্বদেশ থেকে বিদেশে ও তাঁর সুখ্যাতির খবর ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

তাঁর যোগ্যতায় মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হয়ে অবশেষে খোদ নিযামুল মুলক তাকে বাগদাদ নগরীর নিজামিয়া মহাবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পদে নির্বাচিত করলেন। এ সময় ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) বয়স ছিল মাত্র চৌত্রিশ বৎসর। এত অল্প বয়সে নিজামিয়া মাদ্রাসার সর্বপ্রধান অধ্যাপকের পদে নির্বাচিত হওয়া এমন এক গৌরবের বিষয় ছিল যা একমাত্র তিনি ছাড়া কখনও অন্য কারও ভাগ্যে ঘটেনি। উল্লেখ্য যে, মাদ্রাসায়ে নিজামিয়ার এরূপ মর্যাদা সম্পন্ন পদ লাভ করা এমনি একটি আকাংখিত বস্তু যে, অনেক প্রধান প্রধান সুবিজ্ঞ ব্যক্তি তার আকাঙ্খার দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। অথচ শেষ পর্যন্ত তাদের মনের বাসনা মনের ভেতরই চেপে রেপে রেখে ব্যর্থতার গ্লানি বরণ করে নিয়েছেন।

ইমাম আবু মনসুর মুহাম্মদ বারদী (রহঃ) যিনি বুয়াইয়া মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, তিনি মাঝে মাঝে মাদ্রাসায়ে নিজামিয়ায় এসে মূল্যবান ভাষণ দিতেন এবং ভাষণের মধ্যেই কথা প্রসঙ্গে নিজামিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনা পদ লাভের জন্য নিজের মনের আকাঙ্খা ব্যক্ত করতেন।

ঐ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লামা ইবনে খাকান বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু মনসুর (রহঃ) এ সম্মানিত পদ লাভের জন্য নিশ্চয়ই যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। আর তাঁকে উক্ত পদাভিষিক্ত করার ব্যাপারে তাঁকে প্রতিশ্রুতিও প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, মৃত্যু তাঁহার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করল। সুতরাং তাঁর মনের এই ঐকান্তিক বাসনাটি আর সাফল্য লাভের সুযোগ পেল না।

আল্লামা ফখরুল ইসলাম শাসী (রহঃ) (যার নাম ছিল মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ) একজন উচ্চ পর্যায়ের আলেম ছিলেন। পাঁচশত পাঁচ হিজরীতে যখন তিনি নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হলেন তখন আপনা থেকে তাঁর হৃদয় মধ্যে একটা বিনয় মিশ্রিত কারুণ্যের সৃষ্টি হল এবং তিনি পুনঃ পুনঃ নিম্নোক্ত পংক্তি দুটি উচ্চারণ করতে লাগলেন-

خَلَتِ الدِّيَارُ فَسُدْتُ غَيْرَ مُسَوَّدِ
وَمِنَ الْعَنَاءِ تَفَرُّدِىْ بِسُؤْدَدِىْ

দেশে যখন যোগ্য ব্যক্তিত্বের অভাব ঘটল
তখন আমার মত অযোগ্য লোক পদ লাভ করল।
মূলতঃ এরূপ অযোগ্যের পদ লাভ করা
দেশের জন্য দুর্ভাগ্যের কথা।

যাই হোক ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) চারশত চৌরাশি হিজরীর জামাদিউল উলা মাসে সগৌরবে ও সাড়ম্বরে বাগদাদ নগরীতে আগমন করলেন এবং মাদ্রাসায়ে নিজামিয়ার অধ্যাপনা পদ অলংকৃত করলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর সুগভীর জ্ঞান-পণ্ডিত্ব ও বিচক্ষণতা গুণে তিনি বাগদাদ হুকুমতের জনৈক প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্বে অভিষিক্ত হলেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর দায়িত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি এত অধিক বৃদ্ধি পেল যে, শাসন সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই তাঁর মতামত ব্যতিরেকে নির্ধারিত হত না।

সে যুগে ইসলামী হুকুমত ঐতিহ্যবাহী ও গৌরবময় দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। তার একটি বনু আব্বাস ও অপরটি সালজুক সম্প্রদায়। এই দুটি শাখারই সুধীদের দরবারে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্ররূপে গণ্য ছিলেন।

চারশত সাতাশি হিজরীতে যখন খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ পরলোক গমন করেন এবং মুস্তাজহিরবিল্লাহ খেলাফতের আসনে সমাসীন হন তখন রাজকীয় অমাত্যবর্গের সাথে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) ও তাঁর প্রতি অকপট আনুগত্য প্রদর্শন করেন। খলীফা মুস্তাজহির বিল্লাহ রাজ্যের আলেম ওলামাদের নেহায়েত ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন এবং গুণীর সম্মান দানে উদার প্রাণ ছিলেন। তাছাড়া ইমাম সাহেবের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

খলীফা মুস্তাজহির বিল্লাহর আমলে বাতেনিয়া সম্প্রদায় যখন অত্যন্ত শক্তি সঞ্চয় করল, তখন উক্ত খলীফা ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-কে তাদের বিরুদ্ধে একখানা গ্রন্থ রচনার নির্দেশ দান করলেন। সে মতে ইমাম সাহেব খোদ খলীফার নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন এবং উহার নাম রাখলেন খলীফার নাম অনুসারে 'মুস্তাজহির'।

ইমাম সাহেবের খেলাফত ও হুকুমতের সাথে সম্পর্কের দৃশ্যটি ছিল এইরূপ, আর শিক্ষামূলক ব্যাপারে তাঁর বুজুর্গী ও মর্যাদার নমুনা হল তাঁর শিক্ষাদান কেন্দ্রে তিনশত অধ্যাপক, একশত উমারা ও নেতৃবর্গ উপস্থিত থাকতেন। শিক্ষা প্রদান ছাড়া তিনি সভা-সমিতিতে বক্তৃতাও করতেন। তাঁর এ বক্তৃতা সমূহের প্রধান ও মূল বক্তব্য ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কিত। সুতরাং তার ওয়াজগুলি এলমী ওয়াজ নামেই আখ্যায়িত হত। সাইদ ইবনে ফারেস যিনি ইবনে লোবান নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন তিনি ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর ওয়াজসমূহ সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করে ফেলতেন। এভাবে কম বেশ একশত তিরাশিটি দীর্ঘ বক্তৃতা লিখিত হয়েছিল। এ ওয়াজসমূহের দ্বারা দুখানা মোটা গ্রন্থ তৈরী হয়েছে। পরে স্বয়ং ইমাম সাহেব এ ওয়াজ গুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে, ওগুলি নির্ভুল আছে কিনা। পরবর্তী কালে ইমাম সাহেবের এ ওয়াজ গ্রন্থ দুখানা মাজালেসে গাজ্জালিয়া নামে মশহুর হয়ে গেছে।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) যে ধ্যানের শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তার পরিণতি তো এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক যে, তিনি শুধু স্বীয় শিক্ষার অনুকূল পথ ধরেই চলতে থাকেন। তাছাড়া অন্য কোন দিকে মনে ভুলেও না তাকান, যেমনটা তাঁর সময়সাময়িক যুগের অন্যান্যদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু কথা হল, ইমাম সাহেব একান্ত শুরু থেকেই এক বিশেষ চরিত্রের লোক ছিলেন। যে কোন বিষয়ের তত্ত্ব এবং তথ্য উদ্‌ঘাটনের প্রতি তাঁর একটা চরিত্রগত অভ্যাস ছিল। যে কোন প্রকার সম্প্রদায়ের সাথে উঠাবসা করে তাদের কাছ থেকে তাদের মতবাদ, বিশ্বাস এবং ধারণাসমূহ জেনে নিতেন এবং সে গুলির উপরে গভীর বিচার বিশ্লেষণ চালাতেন।

ইমাম সাহেব নিজেই লিখেছেন যে, আমি এক এক করে ফেরকায়ে বাতেনী, জাহেরী, ফালসাফী, মুতাকাল্লিম এবং জিন্দীক সবার সাথেই মিশেছি প্রত্যেকের সাথে উঠা বসা করেছি এবং তাদের মনোভাব আকীদা প্রভৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়েছি। এভাবে বিভিন্ন মতবাদীদের সাথে মিলামিশা করে তাদের ভাবধারা শুনে ও তাদের মতবাদ নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করার ফলে আমার অবস্থা এমন হল যে, আমার অন্তরের মধ্যে যে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, সে একটি বিশেষ অবস্থা অন্তরের বিরাজ করতেছিল, তা মোড় নিল, আমার জীবনের গতিধারায় পরিবর্তন সূচিত হল।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম থেকেই যেহেতু আমি যে কোন বিষয় বস্তুকে পরখ বা যাচাই করে তা গ্রহণ করতাম, তাই তাক্বলীদের বাধ্যবাদকতা আমার মধ্যে তেমন ঠাঁই পেল না। ফলে বাল্যাবধি যে পরিবেশে মানুষ হয়ে ও যে আক্বীদার কথা শুনে শুনে তা মনের মধ্যে জমে বসেছিল, তা টলটলায়মান হয়ে গেল, মূলতঃ এ ধরণের আকীদা তো ইয়াহুদী খৃষ্টান প্রভৃতির মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত এলেম বা নিরঙ্কুশ জ্ঞান তো কেবল তাকেই বলে, যার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহেরই অবকাশ নেই। যাতে কোন রকমের প্রশ্ন উদয়ের এতটুকু মাত্র সুযোগ নেই। যেমন একটি সুদৃঢ় জ্ঞান-বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ বিষয় এই যে, 'দশ' সংখ্যাটি 'তিন' সংখ্যা অপেক্ষা বড়। এখন কেউ যদি বলে যে, না দশ সংখ্যাটি তিন সংখ্যাটির চেয়ে বড় নয়

বরং তিন সংখ্যাটি দশ সংখ্যাটির চেয়ে বড় আর যদি সে তার এ দাবী প্রমাণের জন্য বলে আমার এ কথা প্রকৃত সত্য এতে কোন সন্দেহ নেই, যেহেতু আমি লাঠিকে একটি সাপে পরিণত করতে পারি। এ বলে সে তা বানিয়েও দেখাল। তখন আমি বলব যে, নিঃসন্দেহে লাঠিকে সাপে পরিনত করা একটি গুরুতর কার্য। কিন্তু তাতে দশ সংখ্যার তিন সংখ্যা অপেক্ষা বড় হওয়ার অটুট বিশ্বাসে কোনরূপ দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

যাই হোক অতঃপর আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, এই ধরণের নিরঙ্কুশ জ্ঞান বা অটুট বিশ্বাস আমার মধ্যে কতটুকু ক্ষেত্রে রয়েছে। দেখা গেল বড় জোর অনুভূতিগত বিষয় সমূহেই শুধু এ ধরণের বিশ্বাস রয়েছে, আর কোন খানে নেই। কিন্তু ধীরে ধীরে অনুভূতিগত ক্ষেত্র সমূহেও বিশ্বাসের মাত্রায় ঘুন ধরা শুরু হয়ে গেল। এরপর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে গেল যে কোন কিছুতেই আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস বজায় থাকল না। অনধিক দুমাস কাল পর্যন্ত আমার এমন অবস্থা ছিল। তারপর আল্লাহর রহমতে আবার এ অবস্থা দূরীভূত হল। অবশ্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদের ওপর আমার যে সন্দেহ বা অনাস্থা ছিল তা' তখনও থেকে গেল।

সে সময় প্রধানতঃ চারটি ফেরকার অস্তিত্ব ছিল। সেগুলো হল (১) মুতাকাল্লিমীন (২) বাতিনিয়া (৩) সালাফিয়া (৪) এবং সুফিয়া। আমি এক এক করে ফেরকাগুলোর বিষয় বস্তু ও আকীদা সমূহের বিশ্লেষণ শুরু করলাম। এলমে কালাম (আকায়েদ) সম্পর্কিত ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনের রচনা ও গ্রন্থ সমূহ গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলাম। কিন্তু তা' আমার মনকে তৃপ্তি প্রদান করতে সক্ষম হল না। কারণ তারা যা কিছু থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন তার ভিত্তি হল তাকলীদ ইজমা অথবা পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফের ইবারত সমূহ। এগুলি ঐ ব্যক্তির বিপক্ষে দলীল হিসেবে গ্রহণীয় নয়, যে শুধু যুক্তি ও আকলী দলীল ব্যতীত অন্য কিছুকে স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তারপরে ফালসাফা বা দর্শনের যে অংশটি অকাট্য অলংঘনীয়, তার ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আর যে অংশটি ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত তা' অকাট্য ও অলঙ্ঘনীয় নয়। অর্থাৎ তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তারপর ফেরকায়ে

বাতিনিয়ার কথা বলা যায়, এর ভিত্তিই হল ইমামে ওয়াক্ত (সমকালীন ইমাম) এর তাকলীদের ওপরে। কিন্তু উক্ত ইমামের হক্কানিয়ত সম্পর্কে দৃঢ় আস্থাশীল হওয়া যায় কি করে?

বাকী র'ল শুধু তাছাওফ বিষয়টি। অবশেষে আমি সে বিষয়টির প্রতিই মনোনিবেশ করলাম! এ বিষয়ের ওপরে হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) আল্লামা শিবলী (রহঃ) এবং হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) প্রমুখের যা কিছু বক্তব্য তা দেখলাম। আবু তালিব মক্কীর কিতাব কুওয়াতুল কুলুব এবং হারেস মুহাযাবী (রহঃ) রচিত বিষয় সমূহ অধ্যয়ণ করলাম। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়টি যেহেতু শুধু কর্মের মাধ্যমেই অবহিত হওয়া যায় ও উপলব্ধি করা যায়। তাই শুধু শিক্ষা দ্বারা এটা বুঝতে পারা গেল না। কর্মের জন্য প্রয়োজন ছিল ত্যাগ ও কৃচ্ছতা সাধনের। পক্ষান্তরে আমার কার্য সমূহে খলুছিয়তের অভাব ছিল শিক্ষা প্রদান ও এলেম চর্চার দিকে মনের আকর্ষণ ছিল এ কারণে যে, সুনাম সুখ্যাতি বর্দ্ধিত হবে। এসব কারণ আমার হৃদয় মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করল যে, আমি বাগদাদ নগরী পরিত্যাগ করি এবং যে কোন ক্রিয়া কর্মের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলি। চারশত অষ্টআশি হিজরীর রজব মাসে আমার হৃদয়ে এরূপ আকাঙ্খা সৃষ্টি হল। অতঃপর ছয়টি মাস আগ্রহ অনাগ্রহ অর্থাৎ দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে অতিবাহিত হল। মন কোন ক্রমেই একথা মেনে নিতে চাচ্ছিল না যে, আমার এই অত্যুচ্ছ সম্মান মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বকে ঝেরে মুছে ফেলে দেই। এই ধরণের ইতস্ততার মধ্যে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছল যে, আমার রসনা নির্বাক হয়ে গেল। শিক্ষা প্রদান কার্য বন্ধ হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে পরিপাক শক্তি দুর্বল হয়ে গেল। শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি দেখা দিয়ে তা এমন পর্যায়ে পৌছে গেল যে, চিকিৎসকগণ চিকিৎসায় অপারগ হয়ে চেষ্টায় বিরত হল এবং পরিষ্কার বলে দিল যে, এ ধরণের অবস্থায় চিকিৎসা কার্যকরি হয় না। শেষ পর্যন্ত আমি দেশ ভ্রমণের দৃঢ় আকাঙ্খা পোষণ করলাম। ওলামাবৃন্দ এবং পদস্থ রাজকর্মচারীগণ যখন আমার এ মনোভাবের বিষয় জানতে পারলেন, তখন তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে আমাকে নানাভাবে বারণ করতে লাগলেন

এবং অত্যন্ত আফসুস করে বল্লেন যে, এটা ইসলামের এক পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। বলুন তো ইসলামের উপকার করা থেকে এভাবে বিরত হওয়া কি শরীয়ত অনুসারে জায়েয হবে? স্থানীয় সকল আলেম ওলামাগণই এভাবে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার আমার খুব ভাল ভাবেই জানা ছিল। তাই তাহাদের সব বাধা বিপত্তি, আলোচনা, সমালোচনা উপেক্ষা করে আমি আমার উদ্দেশ্যে অটল থাকলাম এবং শাম অভিমুখে যাত্রা করলাম।

ইমাম সাহেব বাগদাদ থেকে শাম যাত্রা কালে এক অনির্বচনীয় অবস্থার শিকার ছিলেন। তিনি তাঁর মূল্যবান পোশাকগুলি পরিবর্তন করে একটি কম্বল মাত্র পরিধান করলেন। আর তখন থেকে উপাদেয় খাদ্যের পরিবর্তে সাধারণ মামুলী ধরণের খানা খেতে শুরু করলেন।

বাগদাদ থেকে শামের দামেশ্‌ক নগরীতে গিয়ে ইমাম সাহেব কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হলেন। দামেশ্‌কের জামে মসজিদের পশ্চিম দিকস্ত মিনারা কক্ষটি সারাদিন বন্ধ করে রেখে তিনি মোরাকাবায় মোসাহাদার মগ্ন থাকতেন। প্রায় দুবৎসর তিনি দামেশ্‌কে অবস্থান করলেন। যদিও দিবা রাত্রি অধিক সময় তাঁর মোরাকাবা ও যিকির আযকারে অতিবাহিত হত; তবু এলমী চর্চাকে তিনি একেবারে বর্জন করলেন না। দামেশ্‌কের সর্ববৃহৎ মসজিদ তথা জামে উমুবীটি মূলতঃ একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্বরূপ ছিল। তারই পশ্চিম পার্শ্বের একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে বসে শিক্ষার্থীগণকে তিনি এলমী তালীমও প্রদান করতেন।

সমস্ত ঐতিহাসিকগণের মতে ইমাম গাজ্জাজী (রহঃ) শায়থ আবু ফারমিদীর (আফজাল ইব্‌নে মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) নিকট এলমে তাছাওয়াফের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। যতদূর সম্ভব তিনি সাতাইশ বছর বয়ক্রম কালে তঁর নিকট থেকে গোরবতের বাইয়াত নিয়েছিলেন। শায়খ আবু আলী (রহঃ) তুস নগরীতে তথা হযরত ইমাম গাজ্জালী রহঃ)-এর জন্মস্থান মৃত্যুবরণ করেছিলেন।।

শামে দুবছর অবস্থানের পর ইমাম সাহেব সেখান থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওয়ানা করলেন। বাইতুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করে তথা হতে মকামে ইব্রাহীমি তথা যেখানে হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) মাযার শরীফ অবস্থিত সেখানে তাসরীফ নিলেন।

অতঃপর সেখান থেকে হজ্জ্ব আদায়ের নিয়তে পবিত্র মক্কা ও মদীনা ভূমির পাণে যাত্রা করলেন। মক্কা মুয়ায্যমায় বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। এই সফরেই তিনি মিসর ও ইসকান্দারিয়ায়ও বহুদিন অবস্থান করলেন।

মোটকথা এ সফরে তিনি দীর্ঘ দশটি বছর কাটিয়ে দিলেন। সফরে বহু পুণ্যময় স্থানে গমন করেন এবং বহু প্রাচীন পরিত্যক্ত বিরান শহরাদিতে গিয়ে তার দৃশ্যসমূহ অবলোকন করে আল্লাহর সৃষ্টি ও ধ্বংস রহস্যের তত্ত্বোদ্‌ঘাটনে ব্রতী হন।

প্রবাস জীবনে চারিশত নিরানব্বই হিজরীতে যখন তিনি মকামে ইব্রাহীমে উপনীত হন তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মাজার শরীফে দাঁড়িয়ে তিনি তিনটি বিষয়ে সপথ গ্রহণ করেন যথা- (১) কখনও কোন রাজা বাদশাহর দরবারে গমন করব না। (২) কোন বাদশাহ বা আমীর উমারার হাদিয়া গ্রহণ করব না। কারও সাথে কোন বিষয় নিয়ে তর্ক বাহাসে অবতীর্ণ হব না। বস্তুতঃ এরপর থেকে আমরণ তিনি এ সপথ বা প্রতিজ্ঞা পালন করে গিয়েছিলেন।

এহইয়াউল উলুম রচনা

আল্লামা ইবনে আছীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ এহ্‌ইয়াউল উলুম নামক কিতাবখানা উক্ত দশ বছরের প্রবাস জীবনে রচনা করেছিলেন এবং দামেশকের অসংখ্য ভক্ত আগ্রহীগণ তার কাছ থেকে নিয়ে এ গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন।

কিন্তু কোন কোন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এ ঘটনার সত্যতার উপরে এ কারণে প্রশ্ন তুলেছেন যে, এ ধরনের আত্মভোলা প্রবাস জীবনে এই শ্রেণীর একখানা গ্রন্থ রচনা করা কি প্রকারে সম্ভব হতে পারে? তাঁদের মতে এ সময় ইমাম সাহেব যেরূপ আত্ম বিস্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তাতে কিছুতেই তখন এ কিতাব তার দ্বারা রচিত হতে পারে না এবং এ সময় তিনি এ কিতাব রচনা করার জন্য সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবনা চিন্তা করতে পেরেছেন বলে কেউ বিশ্বাসই করবে না।

কিন্তু তারা যাই বলুন না কেন আপ্রাণ চেষ্টা তদন্ত ও তত্ত্বোদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে জানা গেছে যে, উল্লিখিত দশ বছরের প্রবাস জীবনে তাঁর আত্মভোলা অবস্থা সর্বদাই একরূপ ছিল না। প্রবাস কালে কখনও তিনি নিজেকে নিজে একেবারে হারিয়ে বসতেন। সে সময় তার কোন কিছু রচনা করা তো দূরের কথা সুস্থ সঠিক ও নিখুঁত ভাবে কথাবার্তা বলা পর্যন্ত সম্ভব ছিল না। আবার এ সফরেই কখনও কখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও ধীরস্থীরভাবে নানা ধরণের এলমী চর্চায় লিপ্ত হতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আকায়েদ শাস্ত্রের কাওয়ায়েদুল আকায়েদ নামক কিতাবখানা তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের অধিবাসীদের অনুরোধে এই সফর কালেই লিখেছিলেন।

তাহাছাড়া আবুল হাসান আলী ইবনে মুসলিম যিনি ইমাম সাহেবের শিষ্য ছিলেন ইনি অত্যন্ত কাবেলিয়াত সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর যোগ্যতা ও বিজ্ঞতার কারণে লোকগণ তাঁকে জামালুল ইসলাম বা ইসলামের সৌন্দর্য আখ্যায় ভূষিত করেছিল। এ ব্যক্তি ইমাম সাহেবের নিকট থেকে তাঁর উক্ত সফরকালেই এলেম হাসিল করেছিলেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

সফরের শেষভাগে হজ্বের সময় উপস্থিত হল, ইমাম সাহেব তখন মক্কায় অবস্থান করতেছিলেন। তিনি হজ্ব আদায় করলেন। হজ্ব সমাপনান্তে ইমাম

সাহেবের সন্তান–সন্ততিগণ তাকে পীড়াপীড়ি করে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন বটে, কিন্তু নির্জন প্রিয়তা ও মৌনতা অবলম্বন তাঁর দেশে ফেরার পরেও অব্যাহত র'ল। কিন্তু উপজীবিকার জন্য তাঁকে যথারীতি কাজ করে যেতে হত। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও নিরুদ্বিগ্নতা তাঁর খুব কমই নছীব হয়েছিল।

যে বস্তু ইমাম সাহেবকে মৌনতা ও নির্জনতা প্রিয়তার দিকে আকৃষ্ট করেছিল, তা প্রকৃত সত্যোদ্‌ঘাটনের আকাঙ্খা ব্যতীত আর কিছু নয়। এভাবে নির্জন ও মৌণ সাধনা তাঁর অন্তরকে এমন স্বচ্ছ ও নিস্কলুষ করে তুলেছিল যে, তথা হতে সমস্ত বাহ্যিক আবরণ ও পর্দাসমূহ বিদূরীত হয়ে গিয়েছিল। মনে যত রকমের দ্বিধা সন্দেহ ছিল সব কিছু দূর হয়ে গিয়েছিল।

মৌনতা ও নির্জন প্রিয়তা বর্জন

সত্যোদ্‌ঘাটনের পর ইমাম সাহেব লক্ষ্য করলেন যে, মাযহাবী হওয়া দিন দিন টলটলায়মান হতে যাচ্ছে, দর্শন ও বিজ্ঞানের মোকাবেলায় ধর্মীয় অস্তিত্ব ক্রমেই যেন নিস্তেজ ও বিলীন হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে। তখন তিনি মৌনতার গণ্ডি ভেদ করে তা থেকে বেরিয়ে এসে এশায়াত ও তাবলীগে দ্বীনের পথে আত্মনিয়োগ করার মনস্থ করলেন। এদিকে তখন শাসন ক্ষমতা সালজুক বংশীয় মালিক শাহের পুত্রের হাতে এসে পড়েছিল। তাঁর তরফ থেকে ইমাম সাহেবের প্রতি এক অনুরোধ পত্র এল যে, আপনি জনগণের সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করুন। এ অনুরোধ পত্রে গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য স্বয়ং বাদশাহর উজীর নিজামুল মুলকের পুত্র ফখরুল মুলক নিজেই ইমাম সাহেবের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং অত্যন্ত বিনয় সহকারে অনুরোধ জানালেন যে, আপনি নিশাপুরের নিজামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকতা পদ গ্রহণ করুন।

ইমাম সাহেবের ইতস্ততা তখনও পুরোপুরি দূর হয়নি, তিনি এ ব্যাপারে তাঁর বন্ধু–বান্ধব এবং সুফী সাধকগণের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা সবাই

তাঁকে নির্জন বাস পরিহার করে জনসাধারণের মধ্যে চলে আসার জন্য পরামর্শ দান করলেন। অনেক বুযর্গ ব্যক্তি এ সময় খাবযোগে জানতে পেলেন যে, ইমাম সাহেবের এ পদ গ্রহণ করা আল্লাহর সন্তুষ্টির স্বরূপ হবে। সর্বোপরি ইমাম সাহেবের নিজের একটি কথা স্বরণ হল যে, হাদীস শরীফে উক্ত হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতি শতাব্দিতে একজন মুজাদ্দিদ পয়দা করেন। ঘটনাক্রমে এ সময় পঞ্চাশ শতাব্দির শুরু হতে মাত্র একমাস বাকী ছিল।

উল্লেখ থাকে যে, উল্লিখিত কারণ সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম সাহেব তৎপ্রতি অনুরুদ্ধ প্রস্তাবকে মুঞ্জুর করলেন এবং চারশত নিরানব্বই হিজরীতে নিশাপুরের মাদ্রাসায়ে নিজামিয়াতে অধ্যাপনার পদ অলংকৃত করলেন।

মাদ্রাসায় অধ্যাপনার পদে অধিষ্টিত হয়ে তিনি পূর্বানুরূপ যথারীতি মাদ্রাসার শিক্ষকতা কার্যে ব্যপৃত হলেন। ইহার মাত্র কিছু দিন পরেই পাঁচশত হিজরীতে উজীর ফখরুল মূলক জনৈক বাতিনিয়া সম্প্রদায়ের হাতে নিহত হলেন।

এই হত্যা ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই ইমাম সাহেব পুনরায় তাঁর শিক্ষকতা পদ পরিত্যাগ করে তুসনগরীতে চলে গেলেন এবং স্বীয় গৃহে বসবাস শুরু করলেন। তিনি নিজ বাসস্থানের নিকটেই একটি মাদ্রাসা স্থাপন করলেন। মৃত্যুর পর্ব পর্যন্ত তিনি এখান থেকেই লোকগণকে এলমে শরীয়ত ও মারেফাতের শিক্ষা প্রদান করতেছিলেন।

বিপক্ষীয়দের শত্রুতাচরণ

ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) প্রতি স্বীকৃতি যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাঁর প্রতি হিংসুকের সংখ্যাও তেমনি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। বিশেষতঃ ইমাম সাহেব এহইয়া গ্রন্থে যেভাবে হিংসুক ওলামা ও রিয়াকার মাসায়েখদের

সম্বন্ধে স্বীয় বক্তব্য পেশ করে তাদেরকে নিজের প্রতি শত্রুভাবপন্ন করে তুলেছিলেন। এ ব্যাপার ক্রমে এতদূর গড়াল যে, একটি বিরাট দল তাঁর প্রতি বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে গেল এবং প্রকাশ্য ভাবেই তাকে অপমান করার জন্য বদ্ধ পরিকর হল। সে সময় খোরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন সালজুক বংশীয় শাসক মালিক শাহের কনিষ্ঠপুত্র সানজার। এই বংশীয় লোকগণ ইমাম আজম আবুহানিফার (রহঃ) প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং নেক ধারণা পোষণ করত এবং এ খানদানের লোকেরাই তাঁর মাজার শরীফে গুম্বজ বিশিষ্ট রওজা তৈরী করে দিয়েছিল।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) প্রথম যৌবনে মানসুল নামক একখানা উসুলে ফিকাহর কিতাব প্রনয়ন করেছিলেন। তারই একস্থানে তিনি ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) প্রতি কঠোর মন্তব্য করেছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে কতগুলি অতি নির্ভিক উক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) বিপক্ষীয়দের জন্য এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ স্বরূপ ছিল। তারা বাদশাহ সানজার এর দরবারে উপস্থি হয়ে ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) মন্তব্যগুলিকে অধিকতর রং লাগিয়ে, বাড়িয়ে ও ফুলিয়ে ফাপিয়ে প্রকাশ করল। সাথে সাথে ইমাম সাহেবের অন্যান্য মন্তব্য সমূহে ও উল্টা পাল্টা ব্যাখ্যা করে বাদশাহর কাছে বিকৃত করল এবং আরও বল্ল যে, ইমাম গাজ্জালী নিশ্চয় একজন নাস্তিক আকীদা সম্পন্ন লোক।

বাদশাহ তেমন জ্ঞানী ও আলেম ছিলেন না যে নিজেই তিনি তাদের অভিযোগ সম্পর্কে কোন মীমাংশায় উপনীত হবেন। অতএব তিনি তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলেন এবং ইমাম সাহেবকে দরবারে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দান করলেন। ওদিকে ইমাম সাহেব কিন্তু ইতিপূর্বে মাকামে ইব্রাহীমে বসে শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে, তিনি আর কখনও কোন রাজা বাদশাহর দরবারে তাশরীফ নিবেন না। পক্ষান্তরে বাদশাহর নির্দেশকেও সম্মান দান করা কর্তব্য। তাই তিনি মাশহাদে রেজা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে সেখান থেকে বাদশাহর সমীপে এক খানা সুদীর্ঘ চিঠি লিখে পাঠালেন। চিঠিতে অন্যান্য বক্তব্যের সাথে একথাও তিনি উল্লেখ করলেন যে, আমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মাজার শরীফে বসে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমি আর কখনও কোন

রাজা বাদশাহ বা আমীর উমরার দরবারে গমন করব না। সুতরাং অনুরোধ এই যে, আমাকে ওয়াদা ভঙ্গের জন্য বাধ্য না করা হোক।

চিঠিখানা পাঠ করার পর বাদশাহর ইমাম সাহেবের সাথে সাক্ষাত করার ইচ্ছা প্রবল হল এবং তিনি তার সভাষদগণকে বল্লেন, আমি চাই তাঁর সাথে সামনা সামনি আলোচনা করে তাঁর আকীদা ও ধারণা সম্পর্কে অবহিত হব।

ইমাম সাহেবের প্রতি শত্রুভাবাপন্নগণ বাদশাহর কথায় মনে মনে নাখোশ হল। তারা ভাবল, নাজানি ইমাম সাহেব বাদশাহকে তাঁর কথাবার্তার দ্বারা যাদু করে ফেলেন। হয়ত বা বাদশাহ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান। সুতরাং তারা প্রচেষ্টা চালাল যাতে ইমাম সাহেব বাদশাহর দরবারে না আসতে পারেন এবং সেনানিবাস পর্যন্ত এসে তথায় অবস্থান করেন। এই উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তারা শাহী দরবারের বাইরেই একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করল। বাদশাহকে তারা বুঝিয়ে বল্ল যে, এখানেই বাহাছ ও মুনাজিয়ার মাধ্যমে তাকে যাচ-পরতাল করে নেয়া যাবে।

ওদিকে এইরূপ বিতর্ক অনুষ্ঠানের সংবাদ ছড়িয়ে গেলে তুস থেকে বহু সংখ্যাক আলেম ফাজেল সেনানিবাসে এসে বল্লেন যে, আমরা ইমাম সাহেবের শাগরিদ। বিতর্কিত বিষয় সমূহ প্রথম আমাদেরই সম্মুখে পেশ করা হোক। আমরাই সে বিষয়ে তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্ত সমূহ বিবৃত করব অযথা এ ব্যাপারে ইমাম সাহেবকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। তারপর যদি এ ব্যাপারে আমরা অপারগ হয়ে পড়ি তাহলে ইমাম সাহেবকে বৈঠকে উপস্থিত করা যাবে।

বাদশাহ দুপক্ষের এ ধরণের কোন্দল থেকে উত্তম মনে করলেন যে, এই প্রকার বিতর্ক অনুষ্ঠানের চেয়ে স্বয়ং ইমাম সাহেবকে সম্মুখে ডেকে নিয়ে ফায়ছালা করা হোক। এ সময় মুঈনুল মুলক নামক এক ব্যক্তি বাদশাহর উজীর ছিলেন, তিনি বাদশাহর নির্দেশ নিয়ে ইমাম সাহেবের দরবারে পৌছলেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও আদবের সাথে বাদশাহর দাওয়াতপত্র তাঁর হাতে

দিলেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইমাম সাহেব উজীরের সাথে বাদশাহর দরবারে হাজির হলেন। বাদশাহ আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান দেখালেন এবং তাঁকে শাহী কুর্সীতে নিজের পার্শ্বে বসালেন। প্রথম পর্যায়ের আলাপালোচনার পর ইমাম সাহেব বাদশাহকে সম্বোধন করে এক দীর্ঘ বিবৃতি শুরু করলেন। যা তাঁর মাকতুবাতে উল্লিখিত রয়েছে।

উভয়ের মধ্যে কথোপকথনের শেষ পর্যায়ে ইমাম সাহেব বল্লেন, তোমাকে আমি দুটো কথা বলছি, এক হল, তুস নগরীর অধিবাসীবৃন্দ পূর্ব থেকেই অব্যবস্থা এবং অত্যাচার জর্জরিত ছিল। তারপর এখন দুর্ভিক্ষজনিত কারণে তারা একেবারে ধ্বংস হতে চলছে। তাদের প্রতি দয়ামূলক ব্যবস্থা কর, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করবেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে মুসলমানদের ঘাড় দুঃখ-কষ্টের ভারে ভেঙ্গে পড়ছে পক্ষান্তরে তোমার বাহন অশ্বের ঘাড় নুয়ে পড়ছে স্বর্ণ শিকলের ভারে।

দ্বিতীয় কথা হল, আমি দীর্ঘ বারটি বছর ধরে লোক-সংশ্রব ত্যাগ করে নির্জন বাস করতে ছিলাম। বার বছর পরে তোমার উজীর মুঈনুল মূলক আমাকে তোমার এখানে আসতে বাধ্য করে ছাড়ল। আমি তাকে বলেছি যে দেখ, সময় এমন এসেছে যে, যদি কেহ একটি মাত্রও সত্য কথা বলতে চায় তবে সব লোক তার সাথে শত্রুতা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু মুঈনুল মূলক আমার কথায় কর্ণপাত না করে বল্ল, আমাদের বাদশাহ ন্যায় নিষ্ঠ। তবু যদি অপ্রিয় কোন কিছু ঘটবার উপক্রম হয় তাহলে আমি নিজে তার জিম্মাদার থাকলাম।

উজীরের এই প্রকার পীড়াপীড়ির কারণে আমাকে নিজের শপথ ভঙ্গ করে এখানে আসতে বাধ্য করে। আমার সম্বন্ধে যে বলা হচ্ছে, আমি হযরত ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) প্রতি কটাক্ষ এবং তিক্ত সমালোচনা করছি। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি তাঁহার সম্পর্কে আমার ধারণা ও মনোভাব আমার লিখিত কিতাব এহ্য়াহইয়াউল উলুম গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। আমি তাঁকে ফিকাহ শাস্ত্রে নিত্যকার অবলম্বনীয় ব্যক্তিরূপে মনে করি।

ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) উক্ত রূপ মন্তব্য বাদশাহকে যারপর নাই

প্রভাবান্বিত করল। তিনি বল্লেন, আপনার মনের এ অবস্থার কথা আপনি নিজের হাতে লিখে দিন। তা আমি সারা দেশে প্রচার করে দেই। তারপর আমি বলছি, আপনাকে অবশ্যই শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমি এক নির্দেশ জারী করব, দেশের সমস্ত আলেমকে বছরে একবার অন্ততঃ আপনার কাছে উপস্থিত হয়ে সমস্যাবলীর সমাধান করে নিবে।

বাদশাহর সাথে ইমাম সাহেবের এভাবে একটি সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বাদশাহর দরবার থেকে বিদায় নিয়ে স্বীয় জন্মস্থান তুসে চলে আসলেন। তথাকার অধিবাসীবৃন্দ বিরাট আয়োজন ও জাঁকজমকের সাথে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে তাঁর গুণ ও যোগ্যতার সম্মান দান করল।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, বিরোধী ব্যক্তিরা তখন ইমাম সাহেবের সাথে শত্রুতা করা থেকে বিরত হল না। তাদের কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি পরিষ্কার ভাবে বলুন মাজহাবী ব্যাপারে আপনি কোন মাজহাবের অনুসারী?

ইমাম সাহেব তাদের প্রশ্নের জবাব দিলেন। বিবেকযুক্তি সম্পর্কিত ব্যাপারে আমি স্বীয় সুস্থ জ্ঞানের অনুবর্তী এবং নকলী দলীল হিসাবে আমি পবিত্র কোরআনকে মান্য করি।

বিরোধীগণ তাঁর জবাব শুনার পর উঠে দাঁড়াল এবং তাঁর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করল।

অধ্যাপনা পদের জন্য পুনরাহ্বান ও তা প্রত্যাখ্যান

ইমাম সাহেবের নিকট থেকে পরিষ্কার জবাব শুনার পর বিরোধী লোকেরা তাঁর কাছ থেকে চলে এসে চুপকরে থাকল না। তারা তাঁকে যে

কোন ভাবে হোক জব্দ এবং অপদস্থ করার জন্য পণ করে নেমেছিল। এবার তারা তাঁর রচিত মিশকাতুল আনোয়ার এবং কিমিয়ায়ে সা'আদত নামক গ্রন্থদ্বয়ের কোন কোন বিষয়ের উপরে নানাবিধ প্রশ্ন উথাপন করে তা তাঁর দরবারে প্রেরণ করল। তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠ এবং সবিস্তারে তার জবাব লিখে পাঠালেন। তাঁর এ জবাবগুলো যথাযথভাবে তাঁর মাকতুবাত শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে।

এভাবে ইমাম সাহেবের সাথে বিরোধী দলের বিরুদ্ধাচরণ কিছুটা প্রশমিত হয়ে গেল বটে, কিন্তু তাঁর সম্মুখে আর এক সমস্যা এসে দেখা দিল। তাঁর প্রতি জনসাধারণের সীমাহীন স্বীকৃতি এবং তাঁর অতুলণীয় খ্যাতিই যেন তাঁর এতটুকু স্বস্তি ও বিশ্রাম গ্রহণের প্রতি হুমকী স্বরূপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। বিপক্ষীয় দিকের উৎপীড়ন কিছুটা স্তিমিত হবার সাথে সাথেই বাগদাদের সালজুকি শাসক খলীফা মুস্তাজহির বিল্লাহ এবং তাঁর সভাষদগণ সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা চালালেন যাতে ইমাম সাহেব পুনরায় বাগদাদের নিজামিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ পুনঃ গ্রহণ করেন। তাঁদের পক্ষ থেকে বার বার দাওয়াত পত্র আসতে থাকে। ইমাম সাহেব তাদের এ পত্রগুলির একখানা দীর্ঘ জবাবপত্র লিখে তাদের নিকট প্রেরণ করেন। তাতে তিনি বাগদাদ না যাওয়ার পক্ষে নানাবিধ ওজর প্রকাশ করেন, এবং বাগদাদ যেতে তিনি একেবারে অপারগ তা একেবারে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেন।

বাদশাহর পক্ষ থেকে কিন্তু এ চিঠি পাওয়ার পরেও চেষ্টা চলতে থাকে। এমন কি বাদশাহ এক চিঠির মারফত তাকে স্পষ্ট ভাষায় স্বীয় নির্দেশের কথা এলান করে দেন যে, আপনার কোন ওজরই আমি শুনতে প্রস্তুত নই। যে কোন অবস্থায় হোক আপনাকে বাগদাদ নগরীতে এসে মাদ্রাসার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

বাদশাহর এ ধরনের নির্দেশ পেয়ে ইমাম সাহেব এক দারুণ অশান্তি ও অস্বস্তির মধ্যে পতিত হলেন। কিন্তু তা যতই হোক না কেন তিনি তাঁর মনোভাবের উপর অবিচল থাকলেন এবং দুর্জয় সাহসিকতার সাথে বাদশাহকে

নিজের অনিচ্ছার কথা জানিয়ে দিলেন যে, কোন ক্রমেই আমার পক্ষে মাদ্রাসার অধ্যাপনার পদে নিযুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

হাদীস শিক্ষা

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) পাঠ্য জীবনে বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষার চরম পর্যায়ে উপনীত হলেও এলমে হাদীসে তাঁহার শিক্ষার স্তর ছিল নিম্ন। বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষার পরে সময়ের অভাব এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাব প্রভৃতি কারণে তিনি হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জনে বঞ্চিত রহিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁহার হাদীস শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হল। এ ব্যাপারে তাঁহার ভাগ্যও সুপ্রসন্ন ছিল। আল্লাহর রহমত তো তৎপ্রতি অবশ্যই ছিল, তাই ঘটনাক্রমে হাফেজ ওমর ইবনে আবিল হাসান নামক তৎকালীন এক প্রখ্যাত মুহাদ্দিস তুস আগমন করলেন। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তাঁহাকে সসম্মানে ও অত্যন্ত যত্ন সহকারে নিজের গৃহে স্থান দান করলেন। এই মুহাদ্দিসের নিকট হইতে তিনি হাদীস শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ছখানা গ্রন্থ বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের আদ্যোপান্ত তালীম গ্রহণ করেন। মুহাদ্দিস সাহেব তাঁর এই অপূর্ব প্রতিভাশালী ছাত্রকে নিজের মনোমত করে হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী করে তুলেন। এই সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের সংসর্গ ও শিক্ষাদানের পর ইমাম সাহেব এলমে হাদীসেও সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিদদের একজনে পরিণত হন।

ইমাম সাহেব তাঁর শেষ জীবনে যদিও ইবাদত বন্দেগীতে অধিক সময় ব্যয় করতেন এবং দিবারাত্র কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করতেন তবু কিতাবাত ও গ্রন্থ রচনা কার্য কোনদিন তাঁর ব্যহত হয় নাই। উহা সর্বদা সমভাবেই জারী ছিল। উসুলে ফিকাহ শাস্ত্রের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মুস্তাসফী কিতাবখানা, যাহা তাঁর রচিত উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থসমূহের অন্যতম, তা তাঁর জীবনের এ সময়কারই রচিত।

পাঁচশত চার হিজরী সনে এই গ্রন্থখানার রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। এর মাত্র এক বছর পরই তিনি পরলোক গমন করেন।

মৃত্যু ঘটনা

পাঁচশত পাঁচ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসের চৌদ্দ তারিখে তাহেরানে তার জীবন সমাপ্তি ঘটে।

আল্লামা ইবনে জাওযী (রহঃ) তাঁর মৃত্যু ঘটনার কথা খোদ ইমাম সাহেবের ভ্রাতা আহমদ গাজ্জালীর বর্ণনা অবলম্বন করে লিখেছেন যে, চৌদ্দই জমাদিউল উলা তারিখ প্রাতঃকালে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) সয্যা থেকে গাত্রোত্থান করতঃ অজু করলেন অতঃপর ফজরের নামাজ আদায় করে তাঁর জন্য পূর্বরক্ষিত কাফনের কাপড় চেয়ে পাঠালেন। তা, তার নিকট উপস্থিত করা হলে উহা তিনি চোখে মুখে ও মস্তকে বার বার স্পর্শ করালেন। তার পর "আমার প্রভুর নির্দেশ এসে গেছে" এই কথা বলে দু-পা বিছিয়ে দিলেন। নিকটস্থ লোকগণ কিছুই বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে যখন সকলে তাঁর দেহের নিস্পন্দতা লক্ষ করে উদ্বিগ্নভাবে ঝুঁকে পড়ল তখন দেখা গেল তার পবিত্র রূহ অস্থায়ী মৃত্তিকার খাঁচা থেকে বিদায় নিয়েছে। "ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন"।

সন্তান সন্ততি

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) কোন পুত্র সন্তান রেখে যান নি তবে তাঁর কতিপয় কন্যা সন্তান ছিলেন। তন্মধ্যে এক কন্যার নাম ছিল বিনতুল মুনা। বেশ কয়েক পুরুষ পর্যন্তই তাঁর বংশ ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। সাতশত দশ হিজরীতে শায়খ মাজউদ্দীন (রহঃ) নামক যে খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি বিনতুল মুনার বংশধরের ৫ম অধস্তন পুরুষ ছিলেন।

শিষ্য—শাগরেদ

ইমাম গায্যালীর (রহঃ) শিষ্য-শাগরেদ ছিল বহু সংখ্যক। তিনি নিজেই একখানা চিঠিতে তাঁহার এক হাজার শিষ্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি অতিশয় খ্যাতনামা এবং উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে তুমরাত-যিনি স্পেনের তাশেকীন বংশের শাসন বিলুপ্ত করতঃ এক বিরাট হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি ইমাম সাহেবেরই অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তাছাড়া উনদুলুসের প্রখ্যাত ওলামাদিগের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি আবু বকর আররীও ইমাম সাহেবের শিষ্য ছিলেন।

গ্রন্থ রচনা

কাতাবাত বা গ্রন্থ রচনার দিক দিয়া ইমাম সাহেবের অবস্থা ছিল চরম বিস্ময়কর। তিনি জীবিত ছিলেন মাত্র চুয়ান্ন কি পঞ্চান্ন বৎসর। বিশ বৎসর বয়স থেকে তিনি গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। দশটি বছর তার অতিবাহিত হয় মাজযুব অবস্থায়। অবশ্য শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাপ্রদান কার্য তাঁর সর্বদাই জারী থাকে। যখন তাঁহার শাগরেদ সংখ্যা একেবারে কম ছিল তখনও অন্ততঃ দেড়শত শাগরেদ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করত। এছাড়া এলমে তাছাওফের চর্চা, দেশ বিদেশ থেকে আগত মাসয়ালার জবাব প্রদান প্রভৃতি কাজগুলি তাঁর সর্বদাই জারী ছিল। এতদসত্বেও তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে মানুষের বিস্ময় সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থসমূহের কোন কোন খানা এতই বিরাট যে তা কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন বিষয়ের উপরে রচিত হয়েছে। আল্লামা শিবলী নোমানী (রহঃ) প্রায় ৭৮ খানা গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন। গ্রন্থ সমূহ বিভিন্ন শাস্ত্রের উপর লিখিত হলেও বিশেষতঃ ফিকা, উসুলে ফিকা, আকায়েদ, আখলাক এবং তাছাওফ অর্থাৎ যে সকল বিষয়সমূহ তার দ্বারা চরম উন্নতি লাভ করেছে তৎসম্পর্কীত কিতাব সমূহের মান অতিশয় উচ্চ স্তরের।

এগুলির মধ্যে এহইয়াউল উলুমুদ্দীন নামক কিতাবখানা বিশ্বের প্রায় সমগ্র মুসলমানদের নিকটই অতুলনীয় মর্যাদা এবং স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ কিতাবখানা পাঠক সমাজে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, কিতাবখানার কথা উল্লেখ করা মাত্র ইমাম সাহেবের কথা স্মরণে এসে যায় এবং ইমাম সাহেবের কথা উল্লেখ করা মাত্র লোকগণ এহইয়াউল উলুমুদ্দীনের কথা স্মরণ করে।

এহইয়াউল উলুমের মর্যাদা

মুহাম্মদ যাইন ইরাকী (রহঃ) বলেছেন যে, ইমাম সাহেব রচিত এহইয়াউল উলুম কিতাবখানা ইসলামের একখানা উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থ। সায়খ আবু মুহাম্মদ কারযুনী (রহঃ) বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, যদি দুনিয়ার সমস্ত এলেম ও বিলীন করে দেয়া হয় তাহলে শুধু এহ্ইয়াউল উলুম কিতাবখানা থাকলেই হল। কারণ ওর দ্বারাই বিলুপ্ত এলেম সমূহ পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হব।

শায়খ আবদুল্লা ঈদরুস (রহঃ) যিনি একজন বিখ্যাত সুফী ব্যক্তি ছিলেন এহ্ইয়াউল উলুম গ্রন্থের প্রায় আগাগোড়া তিনি মুখস্ত করে ফেলেছিলেন।

শায়খ আলী (রহঃ) প্রায় পঁচিশ বার কিতাবখানা আগাগোড়া অধ্যয়ন করেছিলেন এবং প্রত্যেক বার খতমের পর তিনি দেশের সমস্ত গরীব মিসকীন এবং তালেবুল এলেমদিগকে দাওয়াত করে ভোজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এছাড়া যে সকল সুফী সাধকগণ ইমাম সাহেবের সমসাময়িক ছিলেন তারা কিতাবখানা আল্লাহর এল্হাম সম্বলিত বলে মনে করতেন।

কুতুব শাজলী (রহঃ) জনৈক প্রখ্যাত তাপস ছিলেন। একদা তিনি এহইয়াউল উলুমের একখানা কপি হাতে নিয়ে বাইরে এলেন এবং লোকগণকে তা দেখিয়ে বল্লেন, তোমরা কি জান এ কোন কিতাব? এই কথা বলে তিনি নিজের অঙ্গে একটি চাবুকের আঘাত দেখিয়ে বল্লেন, আমি প্রথম দিকে এ কিতাবখানার প্রতি দ্বিমত পোষণ করতেছিলাম। আজ স্বপ্নযোগে দেখলাম হযরত গাজ্জালী (রহঃ) আমাকে নিয়ে হযরত রসূলে করীম (দঃ) এর দরবারে উপস্থিত করলেন এবং সেখানে আমাকে উক্ত রূপ মত পোষন করার জন্য শাস্তি স্বরূপ আমার অঙ্গে এভাবে চাবুকের আঘাত করা হয়েছে।

নিছক মাজহাবী ধরনে লিখিত কিতাবে দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংমিশ্রন না থাকায় জ্ঞানী-বিজ্ঞানীগণ উহাতে তেমন স্বাদ উপভোগে সক্ষম হত না বরং

মাজহাবী শ্রেণীর মধ্যেও যারা সুক্ষ্মদর্শী, তাদের নিকটও ঐ ধরণের গ্রন্থ সমূহ শুষ্ক নিরস মনে হচ্ছিল।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) স্বীয় যোগ্যতার বলে এই ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখলেন। তিনি দ্বীন ও দর্শন উভয়ের মাঝে এক বিশেষ সমঝোতার সৃষ্টি করে এহইয়াউল উলুম কিতাবখানা রচনা করলেন। ফলে ইহা সমগ্র সুধী মহলে সাথে সাথেই সমাদর লাভ করল।

এমনকি একদিকে যেমন ইহা ইসলামের ইমাম বৃন্দের কাছে ইলাহামে রব্বানী তুল্য মর্যাদা লাভ করল। তেমনি অন্যদিকে কারও কারও কাছে ইউরোপের চারিত্রিক দর্শন অপেক্ষা উচ্চস্তরের দর্শন রূপে বিবেচিত হল। তাদের মতে যদি ইহা ফরাসী ভাষায় কিছুদিন আগে অনুদিত হত তাহলে ফ্রান্সের অধিবাসী যে লোক ইউরোপীয় নবদর্শন আবিস্কারক, লোকে তাকে বলত যে নিশ্চয়ই সে ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) এহইয়াউল উলুম থেকেই স্বীয় মতবাদ ধার করে নিয়েছে।

ইমাম সাহেব এহইয়াউল উলুমে এমন এক চমৎকার পথ অবলম্বন করেছেন যার ফলে সাধারণ অসাধারণ, সাধক, সবার নিকটই উহা গৃহীত ও আদরনীয় হয়েছে।

এই কিতাবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এতে যে বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই সহজ বোধ্য অনায়াসে আয়ত্ত দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ প্রভৃতির দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যার ফলে একদিকে আল্লামা ফখরউদ্দীন রাজীর মত উচ্চশ্রেণীর বিদ্যান ও অন্যদিকে একজন সাধারণ শ্রেণীর বাগ্মী ব্যক্তি ওর দ্বারা সম স্বাদ লাভ করতে পারে।

সে কালে দর্শন বিজ্ঞান সম্পর্কিত যে সকল গ্রন্থ রচিত হত, তা প্রায় সবই অতিশয় জটিল ও পেচানো বাক্যের দ্বারা লিখিত হত। বিশেষ করে শায়খ বুআলী সীনা তার লিখনী দ্বারা দর্শনকে যেন সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে পৌছিয়ে দিয়েছিলেন।

দর্শনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে চারিত্রিক দর্শন তুলনামূলক সহজ বোধ্য তবু বিভিন্ন দার্শনিকগণ উক্ত বিষয়ের উপরে এই ধরণের গ্রন্থ সমূহ রচনা করেছিলেন, সেগুলিকে তারা অহেতুক ভাবে কঠিনতর করে তুলেছিলেন কিন্তু ইমাম সাহেবই সেক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি যিনি ধারণাতীত রূপে কঠিন অপেক্ষা কঠিন বিষয়গুলোও ধারণাতীত রূপে সহজ বোধ্য করে জনসমক্ষে পেশ করলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইবনে মাসকুইয়ার কিতাবত্তাহারাতের কথা উল্লেখ করা যায়। একই বিষয় কিতাবুত্তাহারাতেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং এহইয়াউল উলুমেও বর্ণনা করা হয়েছে। কিতাবত্তাহারাতের ক্ষেত্রে বহু চিন্তা ভাবনা করে বিষয় বুঝতে হবে কিন্তু এহইয়াউল উলুম পড়ার সময়ে এ কথাও মনে হবেনা যে কোন এলমী বিষয় বস্তু অধ্যয়ন করা হচ্ছে বরং মনে হবে যেন কোন কিচ্ছা কাহিনীর মত রসালো বিষয় পড়া হচ্ছে এবং তার ব্যাখ্যা মর্ম শুধু আয়ত্তই নহে বরং পাঠ করে অন্তরে এমন এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হতে থাকবে যাতে তার মধ্যে অন্তর মন পুরোপুরি ভাবে মগ্ন হয়ে যাবে। এহইয়াউল উলুমের এটাই হল এক চরয় বিশেষত্ব যে, উহা পাঠকের মনে এক আশ্চার্য প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এর প্রতিটি শব্দ যাদুর তুল্য প্রভাবশীল, এর প্রতিটি বাক্য মানুষের মনে জযবার সৃষ্টি করে। এর এক প্রধান কারণ হল, যে সময় ইমাম সাহেব এ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তখন তিনি নিজেই জযবার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন যা ইতিঃপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যেমন তিনি পাহাড়-প্রান্তরে বিচরণ কালে, কঠোর সাধনার ফলে এবং ভীষণ কৃচ্ছ্র জীবন যাপন কালে ও জযবাতী জীবন অতিক্রম কালে এ কিতাব রচনা করেছিলেন।

তাওয়াক্কুল এবং কানায়াতের (নির্ভরতা ও অল্পে তুষ্ট) মাসয়ালাটি এশিয়াবাসীর এক চারিত্রিক বিশেষত্ব। এই মাসয়ালাটির ভুল অর্থ গ্রহণের ফলে এশিয়ায় প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায় বিশেষতঃ মুসলিমগণ দীর্ঘদিন ধরে প্রায় নিস্ক্রিয় ভাবে কাল কাটিয়ে দিয়েছে। লোকগণ মনে করেছে যে, জীবিকা উপার্জন থেকে হস্ত গুটিয়ে রাখাই হল তাওয়াক্কুল এবং কানায়াতের তাৎপর্য। মানুষ শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকবে যে, আল্লাহই জীবিকা প্রদান করবেন যেহেতু তিনিই জীবিকা প্রদানকারী। অতএব জীবের জীবিকা প্রদান করা শুধু তাঁরই দায়িত্ব। এ ব্যাপারে মানুষের হাত-পা নাড়া বার প্রয়োজন নেই। যা যার

অদৃষ্টে রয়েছে, তা আপনা থেকেই তার কাছে এসে পৌছবে। এই মতবাদে বিশ্বাসীগণ নিজেদের মতবাদের সহায়করূপে কিছু কিছু প্রশান এবং কতিপয় সুফী দরবেশদের কাহিনী পেশ করে থাকে।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) স্বীয় এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে উল্লিখিত মাসয়ালার উপরে দলীল প্রমাণসহ বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন।

তিনি বলেন, এলেম মানুষের মনে একটি অবস্থার সৃষ্টি করে আর সে অবস্থার দ্বারা কর্মের প্রকাশ ঘটে। কোন কোন লোক মনে করে যে, তাওয়াক্কুলের অর্থ হল, জীবিকার জন্য হাত পা নাড়ার প্রয়োজন বা কোন রকমের চেষ্টা যত্নের প্রয়োজন নেই। বরং মানুষ শুধু জড় বস্তুর ন্যায় বসে থাকবে। এরূপ মনে করা বা ধারণা রাখা মূর্খদের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। শরীয়তে ইহা কঠোর নিষিদ্ধ। ইমাম সাহেব বলেন যে, উসিলা এবং কার্য ভারণ থেকে মোতাওয়াক্কেলের (নির্ভরকারীর) হাত পা গুটিয়ে রাখা সাফ নাজায়েয।

ইমাম সাহেব বলেন যে, সে জিনিস মোটেই আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা নয় যা মানুষকে অলস, অকর্মন্য এবং পরদ্রব্যে লালায়িত করে তোলে। তিনি বার বার এ কথাটিও উল্লেখ করেছেন যে, নির্ভরকারীর শান কখনই এরূপ হতে পারে না যে, যে কারণে অপরের উপার্জনের প্রতি হস্ত বাড়িয়ে দেয়।

জগতে এরূপ প্রসিদ্ধি ঘটেছে যে, আকায়েদ ও এলমে কালাম সম্পর্কে ইমাম সাহেবের মনোভাব ঠিক তদ্রুপ যে মনোভাব এ্যারিষ্টটল এলমে মানতেক সম্পর্কে পোষণ করেছিলেন। মূলতঃ নবুয়ত ও আখেরাত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে মুসলিমগণ যে ধারণা পোষণ করছে, তা ইমাম সাহেব দ্বারাই সুপ্রতিষ্ঠ বটে। সে কালে নকলী এলমে কালামই বেশী প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইমাম সাহেব তদস্থলে আকলী এলমে কালামকে প্রচলিত করে দিলেন। এর ফলে ইবনে খলদুন বললেন যে, ইমাম সাহেবই সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি এলমে কালামের সাথে দর্শনের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

প্রথম দিকে ফোকাহা এবং মুহাদ্দিসগণ মানতেক এবং দর্শন এর দিকে মোটেই লক্ষ্য করেননি বরং ওর কোন প্রয়োজনই অনুভব করেননি। অবশ্য মুতাকাল্লিম সম্প্রদায়ের লোকেরা উল্লিখিত শাস্ত্র দুটি কিছু কিছু চর্চা করতেন। কিন্তু ইমাম সাহেব তার মুস্তাসফী গ্রন্থের ভূমিকায় পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মানতেক শাস্ত্রটি যে কোন শাস্ত্রের জন্য একটি অতি আবশ্যক বস্তু। শুধু এতটুকুই নয় বরং তিনি মাজহাবী রচনার ভেতরেও মানতেকী এহতেলাহাত প্রয়োগ করিয়েছেন।

এ ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)–এর বর্ণনা থেকে। তিনি তাঁর কিতাবুর রদ আলাল মানতেক নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, মুসলিম ওলামাবৃন্দ মানতেকের ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ কার্য বলে মনে করতেন। ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) যমানা থেকেই উহা শুরু হয়েছে। তিনি অন্যত্র লিখেছেন, যিনি সর্বপ্রথম মানতেক শাস্ত্রকে মুসলমানের একটি উসূলী বিষয়ের মধ্যে গণ্য করেছেন তিনি হলেন ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)।

প্রথম দিকে অবশ্য ওলামায়ে কেরাম ইমাম গাজ্জালীর (রঃ) এ সিদ্ধান্তের যথেষ্ট বিরোধীতা করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃত সত্যকে কেউ কোন দিন ঢেকে রাখতে সক্ষম হয়নি। যা সত্য তা আপন শক্তির বলে প্রকাশিত হয়ে উঠবেই। দেখা গেল কিছু দিনের মধ্যেই এলমে মানতেক সবার নিকটই একটি পছন্দনীয় বিষয় রূপে বিবেচিত হল এবং সকলেই একে গ্রহণ করল।

ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) যুগ পর্যন্ত ফারসী ভাষায় আরবী এলেম ও বিষয় সমূহের কোন স্থান ছিল না। ইমাম সাহেবের কিমিয়ায়ে ছায়াদাত রচিত হওয়ার পর থেকে অধিক সংখ্যায় আখলাকী কিতাব রচিত হতে লাগল। ফরাসী ভাষায় বিশেষতঃ ফারসী ভাষার কাব্য সমূহে যে তাছাওফের বিরাট প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে, তা ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) পূর্ব পর্যন্ত একরূপ ছিল না বল্লেই চলে। ইমাম সাহেব যখন ফারসী ভাষায় বিশেষতঃ তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাছাওফী ধ্যান ও ধারণা ঢুকিয়ে দিলেন তখন থেকেই ফারসী কাব্যসমূহ তাছাওফ প্রভাবান্বিত হয়ে উঠল।

সমসাময়িক যুগের শায়খ আত্তার যাকে এই পথের প্রথম পথিক বলে আখ্যায়িত করা হয় তিনি অত্যন্ত সরল সহজ ভাবে ফারসী ভাষায় তাছাওফী খেয়ালাত প্রকাশ করেন। অতঃপর আল্লামা জালালুদ্দিন রুমী ও বিষয়টিকে সাড়ম্বরে ফুটিয়ে তুলেন। অতঃপর সাধক কবি সাদী হাফেজ সিরাজী প্রমুখগণ এ পথে জোরে সোরে অগ্রসর হন।

ইমাম সাহেব বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষতঃ আকায়েদ ও কালাম শাস্ত্রে নানা রূপ সংশোধনী আনেন। এর ভেতরকার ত্রুটি বিচ্যুতি ও অপরিপক্কতা দূর করে দেন। এর নিয়ম প্রনালী ও বুনিয়াদ দৃঢ় করে এর থেকে দোষগুলি হটিয়ে দিয়ে একে একান্ত পরিশুদ্ধতার সাথে মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেন।

ইসলামী আকিদা ও মূল ভিত্তির উপর থেকে দলীল ও প্রামানিক আলোচনা করে সব মোবাহগুলো দূর করে দেন। মোটকথা তিনি কোন একটি দিকে দৃষ্টি প্রদান করা বাকী রাখলেন না।

মোটকথা ইমাম সাহেব উল্লিখিত কীর্তিগুলির ধারায় স্বীয় জীবন কালেই হুজ্জাতুল ইসলাম আখ্যায় আখ্যায়িত হলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে কোন কোন মহল থেকে কিছু কিছু বিরোধিতাও করা হয়েছিল। কিন্তু এ কথা সত্য যে বিরোধিতার কোন উপযুক্ত কারণ ছিল না। তবে এ ব্যাপারে একটি এই দেখা যায় যে তিনি নিজে নিজেকে আশায়েরা সম্প্রদায়ের অনুবর্তিতা থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন। বিভিন্ন মাছয়ালায় তিনি আশায়েরার বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন আর যে সব মাছায়ালায় তিনি আশায়েরার বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন আর যে সব মাছায়ালায় তাদের সহিত একমত ছিলেন, তাতেও তিনি আশায়েরার তাকলীদ করতেন না। বরং তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব ইজতেহাদ দ্বারাই ঐরূপ মত পোষণ করতেন। যা ঘটনাক্রমে আশায়েরা সম্প্রদায়ের অনুরূপ হয়ে যেত।

এ ছাড়া তিনি সে যুগে প্রচলিত ফিকাহ ও এলমে কালামের মর্যাদা কিছু হেয় করে দিয়েছিলেন। উপরন্তু তিনি আকায়েদের ব্যাপারে যেমন কারও অনুবর্তী ছিলেন না তেমনি ফিকাহতেও তিনি কারও তাকলীদ করতেন না।

এ ছাড়া এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে অহঙ্কারীদের অধ্যায়ে মুতাকাল্লেমীন, বক্তা বা ওয়ায়েজীন এবং সূফী দরবেশদের নানারূপ দোষত্রুটি বর্ণনা করলেন। এ সমস্ত কারণের প্রেক্ষিতে একটি বিরাট দল তাঁর প্রতি ক্রোধে অগ্নিশর্মারূপ ধারণ করে। এবং বিভিন্ন দলের বড় বড় ওলামাবৃন্দ তাঁর সাথে বিরোধিতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। স্পেনের ওলামাগণ তাদের প্রধান নেতা কাজী আইয়াজের নেতৃত্বে ইমাম সাহেবের রচনাসমূহ তৎকালীন বাদশাহর সম্মুখে পেশ করলেন এবং মত প্রকাশ করলেন যে, এগুলো সব আগুনে পুড়িয়ে ফেলার যোগ্য। বস্তুতঃ তার কথা মত সেগুলোতে অগ্নি সংযোগ করা হল। এভাবে বিরোধী দলের বিরোধীতার ধারা ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পরও কিছুকাল পর্যন্ত জারী ছিল।

বিরোধী দলের সংখ্যা পরিচয়

এ বিরোধী দলের সংখ্যা যদিও বিরাট ছিল তবু এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলেম ফাজেলের সংখ্যা ছিল সীমিত-ই। তাদের নামগুলো নীচে উল্লেখ করা হল যেমন- (১) আল্লামা আবু বকর ইবনে আরাবী (রহঃ) (২) মারেজী (রঃ) (৩) তারতুশী (রহঃ) (৪) কাজী আইয়াজ (রহঃ) (৫) ইবনুল মুনীর (রহঃ) (৬) ইবনুস সাবাহ (রহঃ) (৭) ইউসুফ (রহঃ) (৮) মারকাশী (রহঃ) (৯) বোরহান বাকীয়া (রহঃ) (১০) ইবনে জাওযী (রহঃ) (১১) ইবনে কাইয়্যেম (রহঃ)।

যে সকল লোক শুধু হিংসা ও শত্রুতাবশতঃ বিরোধিতা করেছিল তাদের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে যারা সতেদ্দেশ্য বশতঃ বিরোধিতা করেছেন, তাদের মনোভাব ও উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখযোগ্য বটে। এদের মধ্যে মুহাদ্দিশ মারেজী (রহঃ) একজন উচ্চ মর্যাদাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তদলিখিত মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থখানা যে কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইনি ইমাম সাহেব সম্পর্কে বহু কিছু লিখেছেন। আল্লামা ইবনুল বাকী (রহঃ) তাবকাতুল শাফিয়াতে তা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তার সার সংক্ষেপ উল্লেখ করা হল।

তিনি বলেন যে, ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) শিষ্যগণকে আমি দেখেছি এবং তাদের নিকট তাঁর অবস্থা ও ধারণাদির কথা বিস্তারিত ভাবে শ্রবণ করেছি,

যেন আমি খোদ গাজ্জালী (রহঃ) কে নিজের চোখেই অবলোকন করেছি। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এলমে ফিকাহতে উসুলে ফিকাহর তুলনায় বেশী যোগ্যতা রাখতেন। এলমে কালামের উপরে ও তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন কিন্তু এ শাস্ত্রে তাঁর তত যোগ্যতা ছিল না। এর কারণ হল এলমে কালাম পুরোপুরি যোগ্যতা অর্জন করার পূর্বেই তিনি দর্শন শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। যার ফলে তার মনে দর্শন শাস্ত্রের প্রভাবই বেশী প্রতিফলিত হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আমি আর একটি খবর শুনেছি যে, এখোয়ানুছ সাফা গ্রন্থ খানা বেশী পাঠ করতেন। উক্ত গ্রন্থ খানার রচয়িতা জনৈক দার্শনিক ব্যক্তি ছিলেন। যিনি দর্শনকে ধর্মীয় বিষয়ের সাথে মিশিয়ে ফেলার পক্ষপাতি ছিলেন।

সে যুগে বুআলী সীনা যিনি দার্শনিকদের ইমাম ছিলেন তাঁর ইচ্ছাছিল আকায়েদে ইসলামকে দর্শনের ছাঁচে ঢেলে গড়াবেন, বস্তুতঃ নিজ যোগ্যতার বলে স্বীয় আকাঙ্খায় তিনি কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) অধিকাংশ মাসয়ালাই বুআলীসীনার মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া তাঁর তাছাওফের মাসয়ালাগুলির ভিত্তি কি তা সঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে মনে হয় যে আবু হাকান তাউহীদীর কিতাবের উপর নির্ভর করেই তিনি তা লিখেছেন। এছাড়া তিনি এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে অত্যন্ত দুর্বল এবং মওজু হাদীস সমূহ উদ্বৃত করেছেন।

বিরোধী দলের আর এক প্রধান ব্যক্তি আবুল অলীদ তারতুশী (রহঃ) ইমাম সাহেবের কাছে নিজে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে তাঁর আকীদা ও ধারণা সম্পর্কে ওয়াকিফ হয়েছিলেন। তিনি বলেন আমি ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) কে দেখলাম, নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত মেধাবী, বিরাট আলেম এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি তালীম আদান প্রদানে রত ছিলেন। কিন্তু শেষ কালে তিনি তা পরিত্যাগ করে সুফীদরবেশদের সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং দার্শনিক মতবাদকে মানসুর হাল্লাজের ভাবধারার সাথে মিশিয়ে ফেলেন। এ সময় তিনি ফোকাহা এবং মুতাকাল্লেমীনদের অপবাদ দিতে থাকেন। এ সময় তার মাজহাবী সীমা অতিক্রম করার অবস্থা হয়ে গিয়েছিল।

এহইয়াউল উলুম রচনা করতে গিয়ে ফন্নে তাছাওফে পুরা মাহারাত না থাকার জন্য যা ইচ্ছা তা লিখেছেন এবং সমগ্র কিতাবে মউজু হাদীস গুলো ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনে বাকী (রহঃ) ইমাম মারেজী এবং তারতুশীর (রহঃ) উল্লিখিত মন্তব্য সমূহ উল্লেখ করে এক এক করে বিস্তারিত ভাবে তার জবাব প্রদান করেছেন। কিন্তু তিনি এভাবে জবাব প্রদান করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কিছুও বলেছেন যে, স্বয়ং গাজ্জালী (রহঃ) ই তাঁর বিরোধিতা করেছেন।

ইমাম সাহেবের দর্শন মিশ্রনের দুর্ণাম দেয়া হয়েছে। জবাব প্রদানকারী বলেছেন যে, তিন দর্শনের পরম শত্রু ছেলেন। তাঁর রচনার সাথে দর্শনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যে লোক ইমাম সাহেবের রচনা সময়হ পড়েছেন এবং দর্শন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছেন তিনি এর সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না।

মুহাদ্দিস ইবনুছ ছালাহ (রহঃ) ইমাম সাহেবের প্রতি এজন্য নাখোশ যে তিনি এলমে মানতেক সম্পর্কিত কিতাব লিতে গেলেন কেন এলমে মানতেক শিক্ষা করা পঙ্কির হারাম। ইবনুল বাকী (রহঃ) ইমাম সাহেবের প্রতি আরোপিত দুর্ণামের জবাব প্রদান করতে গিয়ে তাঁর মানতেক সম্পর্কিত কিতাব রচনার বিষয়টিকে নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবেন না।

ইবনুস সালাহ (রহঃ) এহ ইয়াউল উলুমের ভুল ভ্রান্তির উপরে একখানা কিতাব রচনা করেছেন। তার নাম করণ করা হয়েছে 'আ'লামূল আহেব্বায়ে বে আগলাতিল এহইয়ায়ে"।

আবুবকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মাতুকী (রহঃ) ও ইমাম সাহেবের লিখিত বিষয়গুলোর প্রতিবাদ করেছেন ও তার ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ করেছেন।

মূলতঃ ইমাম সাহেবের রচনা সমূহের প্রতি যে সকল ইলজাম দেয়া হয়েছে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে যদিও তা অবাস্তব ও নিরর্থক তবু এই প্রতিবাদ ও সমালোচনার দ্বারা একটি বিষয় অনুভূত হয় যে, মুসলমানগণ সে

সময় পর্যন্তও ব্যক্তি পূজায় লিপ্ত হয়নি বরং স্বাধীন মতবাদ প্রকাশ করার সৎ সাহস ও মনোভাব তখনও পুরোপুরি বজায় ছিল। ইমাম সাহেবের শিক্ষা ও বুজুর্গীর দেশজোড়া স্বীকৃতি ছিল, এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রনায়ক তাঁর পক্ষে ছিলেন ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন, তবু মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষকে ইমাম সাহেবের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে প্রকাশ্যে মন্তব্য করার ব্যাপারে প্রেরণা যোগিয়েছিল। এ ঘটনার দ্বারা এই শিক্ষাও লাভ করা যায় যে, কোন বিষয়ে পূর্ণ অভিজ্ঞতা ছাড়া সে সম্পর্কে স্বীয় মতবাদ প্রকাশ করায় নিঃসন্দেহে ভুলের অবকাশ থাকে। যেমন ইমাম সম্পর্কে মত প্রকাশ কারকগণ যেহেতু দর্শন ও মানতেক সম্পর্ক কোন জ্ঞান রাখতেন না তাই তাঁরা সে ব্যাপারে ভুল মত প্রকাশ করেছিলেন।

এতদসত্ত্বেও অবশ্য স্বীকার না করে পারা যায় না যে, ইমাম সাহেবের কোন কোন রচনা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য, যেমন তিনি এহইয়াউল উলুমে যে হাদীস সমূহ উদ্বৃত করেছেন, তাতে তেমন সতর্কতা অবলম্বন করেননি, বহু সংখ্যক হাদীসই তিনি উল্লেখ করেছেন মওজু এবং দুর্বল শ্রেণীর। যেগুলির হাদীস গ্রন্থসমূহের তেমন মর্যাদা নেই। তাছাড়া কোন কোন সালফে ছালেহীন সম্পর্কে যে সকল ঘটনা ও মন্তব্য সমূহ পেশ করেছেন তাও অনেকটা বিবেক বর্জিত বটে। তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত এবং নেহায়েত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ছাড়া সে সকল মন্তব্যের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারে না। তদুপরি জুহুদ ও মোজাহাদার বিবরণে তিনি এমন সব কথা লিখেছেন যা ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করেছে। আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম অত্যন্ত কঠোরতার সাথে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন।

আল্লামা মুরতাজা (রহঃ) এহইয়াউল উলুমের ব্যাখ্যা পুস্তকে ইমাম সাহেবের বক্তব্য এবং ইবনে কাইয়্যেমের প্রতিবাদসমূহ বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করে ঐ প্রতিবাদগুলির উত্তর প্রদান করেছেন। কিন্তু সত্যি কথা হল কতগুলি প্রতিবাদ বাস্তবিক এ ধরণের যে তার কোন উত্তর দেয়া যায় না।

যাই হোক ইমাম সাহেব নবী বা রাসূল ছিলেন না। এবং নবী ও রাসূল

ব্যতীত কোন ব্যক্তিই ভুল-ত্রুটি মুক্ত নহে। ত্রুটি-বিচ্যুতি মানুষেরই মধ্যে ঘটে থাকে। অবশ্য শেষ কথা হল মুসলিম জাহানে জগজ্জোড়া প্রতিভার অভাব ছিলনা। নিঃসন্দেহে ইমাম সাহেব তাদেরই একজন এবং তাঁকে নিয়ে আমরা যতটা গৌরব বোধকরি তিনি তদপেক্ষাও বেশী গৌরবের পাত্র।

গাজ্জালী (রহঃ) এর মুল্যবান উপদেশাবলী

হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর জনৈক ভক্ত শিষ্য যিনি দীর্ঘদিন ধরে স্বীয় ওস্তাদের সাহচর্যে থেকে বিভিন্ন এলেম ও নানা শাস্ত্রের বহু কিছুই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। একদা এই ব্যক্তির মনে হঠাৎ এমন খেয়াল জাগল যে, আমি নিজের দীর্ঘ জীবন এলেম শিক্ষা করায় অতিবাহিত করলাম এবং এ পথে বছরের পর বছর ধরে বহু কষ্ট ও ক্লেশ বরণ করলাম। কিন্তু একান্ত পরিতাপের বিষয় যে এখন পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি যে, কোন বিদ্যা প্রকৃত হিত সাধন করবে ও পরকালে কাজে আসবে। কবরের সাথী হবে এবং হাশরের ময়দানে আমার হস্ত ধারণ করবে। আর এও জানিনা যে, কোন এলেম অপকারী ও ক্ষতিকারক হবে যার থেকে আমার পরহেজ করা প্রয়োজন যেমন রসূলে করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, নাউযু বিল্লাহে মিন এলমিন লা ইয়ানফাউ অর্থাৎ সেই এলেম থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি যা কোন উপকারে আসেনা, লোকটির মনে প্রশ্নের উদয় হল, এলেম কি আবার অপকারীও হতে পারে নাকি?

লোকটির মনের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য স্বীয় ওস্তাদ ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) নিকট একখানা আবেদন পত্র লিখে পাঠালেন। পত্রে তিনি এ কথাও উল্লেখ করলেন যে যদিও আমার প্রশ্নগুলির জওয়াব হুজুরের লিখিত গ্রন্থ এহইয়াউল উলুম, কিমিয়ায়ে সা'আদাত, জওয়াহেরুল কোরআন, যিয়ারুল এলম, মিয়ানুল আমল, কাবতাসুল মুস্তাকিম মাআরিজুল কুদুস, মেনহাজুল আবেদীন প্রভৃতি কিতাব সমূহে মৌজুদ রয়েছে এবং এতে অধমের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব

দূর হতে পারে কিন্তু কিতাবগুলিতে বিষয়গুলিকে এত দীর্ঘায়িত করা হয়েছে, যা এ অধমের জন্য দুর্বোধ্য প্রতীয়মান হচ্ছে। তাই এ বান্দা বিশেষভাবে কিছুটা সংক্ষিপ্ত জবাব কামনা করছে। যা সহজ বোধ্য হয় এবং বান্দা তদনুযায়ী আমল করতে পারে।

হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) চিঠিখানা পেয়ে সংক্ষিপ্তভাবে তার জবাব লিখে শিষ্যের কাছে প্রেরণ করলেন। তাঁর সে জবাবগুলি ছিল মহা মূল্যবান উপদেশ। উপদেশমূলক সে চিঠিখানা হুবহু নিম্নে উদ্বৃত করা হলঃ–

হে প্রিয় বৎস! আল্লাহতায়ালা তোমার জীবনকে তাঁর অনুবর্তিতায় দীর্ঘায়িত করে দিন। এবং তোমাকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের পথে চলার তওফীক দান করুন। তোমার জানা উচিত যে, রসূলে করীম (দঃ) থেকে যে সকল উপদেশাবলী বর্ণিত হয়েছে, তাহা সারা জগতে প্রসিদ্ধ এবং সবার হিতসাধনের জন্য তাহাই যথেষ্ট। যদি সে সকল উপদেশ তোমার জানা থাকে তা হলে আমার উপদেশের আর প্রয়োজন কিসের? আর যদি রসূলে করীম (দঃ)–এর সে উপদেশগুলো তুমি না জেনেই থাক তাহলে এতদিন ধরে তুমি শিখলেই বা কি?

তবে সে যাই হোক, বৎস ! শুন, রসূলে করীম (দঃ)–এর যে উপদেশসমূহ রেওয়ায়েত করা হয়েছে তার অন্যতম হলো, রসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন, আলামাতু এ' রাজিল্লাহে আনিল আবদে এশতেগালুহু বেমা লা ইয়া' নীহি ওয়া ইন্ যাহাবাত ছাআতুম মিন উমরিহী ফী গাইরে মা খুলেধা লাহু।

অর্থাৎ–কোন বান্দার উপর থেকে আল্লাহ তায়ালার কৃপাদৃষ্টি উঠে যাওয়ার নিদর্শন হল তার নিরর্থক কাজে ব্যপৃত হওয়া। আর যে ব্যক্তির জীবনের একটি মুহূর্তও ঐ কাজে অতিবাহিত হয় যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়নি তাহলে তাকে বহু অনুতাপ করতে হবে। আর যেব্যক্তির জীবনের চল্লিশ বৎসর কাল অতিবাহিত হয়েছে এবং তার এ সময়ের মধ্যে তার নেক কাজের পরিমাণ বদকাজ অপেক্ষা বেশী হয়নি তবে সে দোজখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

যদি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা যায় তাহলে এই একটি মাত্র এরশাদই উপদেশ লাভেচ্ছুদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

হে প্রিয় বৎস! উপদেশ দান করা খুবই সহজ কাজ, কিন্তু তা গ্রহণ করে তদনুযায়ী আমল করা অত্যন্ত কঠিন বটে। দুনিয়ার এবং লালসার দাস লোকদের কাছে সত্য এবং খাঁটি কথা অত্যন্ত তিক্ত মনে হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা মিথ্যা, অখাঁটি এবং তোষামোদমূলক বাক্যে খুশী হয়ে থাকে। তবে আফসুস সেই লোকদের জন্য যারা এলেম ও জ্ঞান লাভে মগ্ন এবং উপরোক্ত দুঃখজনক রোগে আক্রান্ত। কোন শিক্ষার্থী তো এরূপভেবে বসে আছে যে, শুধু এলেমই তার মুক্তির উছিলা, তার মঙ্গল ও কল্যাণ কেবল এলেম শিখার ভেতরই নিহিত। এ কারণে সে আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যায় এবং তার মনে আমলের খেয়াল পর্যন্ত থাকে না। ধীরে ধীরে তার মনের এ ধারণা মন ও মগজকে এতদূর আচ্ছন্ন করে ফেলে যে, অতঃপর যে কোন উপদেশ দাতার উপদেশ তার জন্য নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়। স্মরণ রেখ, এ ধরনের মনোভাব অত্যন্ত খারাপ এবং মারাত্মক ও এটাই সমস্ত দুর্যোগ এবং গোমরাহীর ভিত্তি। যতদূর সম্ভব আল্লাহর দরবারে আশ্রয় কামনা কর। আর এটাই মূলতঃ ফালসাফীরের মাজহাব আল্লাহ এ থেকে রক্ষা করুন। ভাল করে বুঝে রাখ যে ব্যক্তি এলেম শিক্ষা করে, রোজ কিয়ামতে সে এলেমই তার বিরুদ্ধে ধ্বংসের দলীল এবং প্রমাণ রূপে গণ্য হবে। তোমার কি জানা নেই যে হযরত রসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন " ইন্না আশাদ্দান্নাছে আযাবান ইয়াওমাল কিয়ামাতে আলেমুন লা–ইয়ান ফাউহুল্লাহু বেএলমিহী "অর্থাৎ কিয়ামতে সবচেয়ে বেশী এবং কঠিন আযাব সে আলেম ভোগ করবে, যে এলেম দ্বারা কোন উপকার লাভ করতে পারেনি। বুজুর্গদের কিতাবে লিখিত রয়েছে, হযরত জুনায়েদ বাগদাদীকে (রহঃ) (যিনি একজন প্রখ্যাত অলী ছিলেন) কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জুনায়েদ (রহঃ)। আপনার অবস্থা কি ? জবাবে তিনি বল্লেন, কি আর বলব। কিতাব পত্রের সমস্ত এলেম–কালাম শরা শুরুহাত বে ফায়েদাহ হয়েছে। যা কিছু কাজে লেগেছে তা হল সে দু চার রাকাত নফল নামায, যা রাত্রে আদায় করেছি। অর্থাৎ

জীবনভর কিতাবপত্রের যে সকল লম্বা-চওড়া এলমী আলোচনা সমালোচনা করে এসেছি ও দলীলাদির চর্চা করেছি, তা কোনই কাজে আসেনি। কাজে এসেছে কেবল তাহাজজুদের নামায কয়েক রাকাত। কোন এক ব্যক্তি সত্য কথাই বলেছেন যে, বেশী কথাবার্তা আলাপালোচনা ছেড়ে কাজে মগ্ন হও। যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছাই হল যে তুমি অন্য যা কিছুই কর কি না কর, যথাযথ ভাবে আমল সম্পন্ন কর।

হে বৎসে ! জ্ঞানের কান দ্বারা শ্রবণ কর, শুধু এলেম কখনই সাহায্য ও সহায়তা করতে পারে না যখন পর্যন্ত না তার সাথে আমলের সম্পর্ক থাকে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি জঙ্গলে প্রবেশ করল এবং তার সাথে তরবারী-তীর-ধনুক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্রও মৌজুদ রল, প্রয়োজনকালে এসব হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। জঙ্গলে প্রবেশ করার সাথে সাথে লোকটির সামনে এক ভীষণ ব্যাঘ্র এসে হাজির হল, এখন লোকটি যদি ঐ সমস্ত অস্ত্র ও স্বীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন কাজ না করে তা হলে কি সে ঐ বাঘটির আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে? একইভাবে কোন লোকের শরীরে প্রবল জ্বর দেখা দিল, লোকটির জানা আছে যে, কুইনাইন খেলে তার জ্বর আরোগ্য হবে, তার নিকট কুইনাইন মৌজুদও রয়েছে কিন্তু আলস্যবশতঃ লোকটি কুইনাইন খেলনা, তাহলে সে লোকটির জ্বর আরোগ্য হবে কি? সে জানে যে কুইনাইন দ্বারা জ্বর আরোগ্য হয় এবং তার কাছে কুইনাইন মৌজুদও আছে এতেই কি তার কোন ফল হবে? নিশ্চয় তুমি জান কোন ফল হবে না। জ্বরের ঔষধ না খেলে কিছুতেই তার জ্বর দূর হবে না। বে-আমল আলেমের অবস্থা ঠিক এরূপই হবে। লাখ লাখ মাসয়ালা সে জানে কিন্তু একটি মাসলাও আমল করে না। তবে তুমিই বলত তার মাসয়ালা সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতা কোন কাজ দিবে কি?

প্রিয় বৎস! তোমার এলেম যতই প্রশস্ত ও ব্যাপক হোক না কেন? যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি এলেম অনুরূপ আমল না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার এলেমের

সম্পর্ক বেকার রূপেই গণ্য হবে। কথা হল তুমি শরাব নিয়ে যতই নাড়াচাড়া করবে মনে মনে তা ঢালা ভরা কর কিন্তু এক ফোটা মাত্র শরাব মুখে না দাও তবে তুমি কিছুতেই শরাবের স্বাদ উপভোগ করতে পারবে না। এলেম তুমি যত বেশীই শিক্ষা কর না কর, কিতাবপত্র যত বেশী সংখ্যায়ই অধ্যয়ন কর না কেন, আমল ব্যতীত তা তোমার কোন কাজেই আসবে না।

হে প্রিয় বৎস! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কোন ভাল কাজ করে নিজেকে আল্লাহর রহমতের জন্য যোগ্য না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহর রহমত অর্জন করতে সক্ষম হবে না। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, "লাইসা লিল ইনসানে ইল্লামাসায়া" অর্থাৎঃ মানুষ তার কাজের প্রতিফল ছাড়া আর কিছুই পায় না। তুমি হয়ত বলবে যে, এ আয়াত মনসুখ হয়েছে, যদি তা হয়েও থাকে তবে এ আয়াত সম্পর্কে কি বলবে যা এতদসম্পর্কিত অথচ মনসুখ হয়নি- যেমন "ফামান্ কা-না ইয়ারজু লিক্বায়া রাব্বিহী ফালইয়ামাল আমালান ছালেহান- অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে তার নেক কাজ করা কর্তব্য। তাছাড়া অন্য আয়াত রয়েছে "জাযায়াম বেমা কা-নূ ইয়ামালুন"- অর্থাৎ এ হল সে কাজের প্রতিফল যা সে করত। তাছাড়া অন্য আয়াত রয়েছে- "ইন্না ল্লাযানী আমানূ ওয়া আমেলুছ ছালেহাতে কানাত লাহুম জান্নাতুল ফেরদাউছে নুযুলান খালেদীনা ফীহা" অর্থাৎ- তার জন্য আতিথ্য স্বরূপ জান্নাতুল ফেরদাউছ- যাতে সে অনন্তকাল অবস্থান করবে। তাছাড়া অন্য আয়াতে রয়েছে- "ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা ছালেহান-" অর্থাৎ কিন্তু যে তওবা করেছে ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে। এ ছাড়া হযরত রসুলে করীম (দঃ)-এর সে সমস্ত হাদীস সম্পর্কে কি বলবে যেগুলোতে তিনি আমলকে ইসলামের মূল ভিত্তি এবং ঈমানের জন্য অত্যাবশ্যক করে মন্তব্য করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন, বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিন শাহাদাতু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু ওয়া ঈকামুছ ছালাতে ওয়া ইতাউয যাকাতে। ওয়া ছাওমু রামাজানা ওয়া হাজ্জুল বাইতে মানিস তাতায়া ইলাইহে ছাবীলা অর্থাৎ- ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বস্তুর উপর

প্রতিষ্ঠিত। প্রথম, একথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষ। দ্বিতীয়, নামাজ আদায় করা তৃতীয়, রোজা রাখা ৪র্থ, হজ্ব আদায় করা ৫ম, যাকাত প্রদান করা।

বর্ণিত রয়েছে আল ঈমানু এক্বরারুম বিল্লেছা-নে ওয়া তাছদীকুমবিল জেনা-নে ওয়া আমালুম বিল আরকা-নে। অর্থাৎ-ঈমান হল মুখে উচ্চারণ করা, অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা এবং বাহ্যিকভাবে বিশ্বাসকে কার্যে প্রমাণ করা। মোটকথা আমলের প্রয়োজনীয়তার অসংখ্য দলীল রয়েছে। এখানে অল্প-বিস্তর যা কিছু উল্লেখ করা হল, আশাকরি তোমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু আমার এ বর্ণনা দ্বারা একথা যেন না বুঝে বস যে, মুক্তি কেবল আমলেরই উপর নির্ভরশীল এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর কৃপার কোন হাত নেই। আমল সম্পর্কীত আমার বিবৃতির মোটেই তা উদ্দেশ্য নয়, বরং আমার উদ্দেশ্য মাত্র এই যে, বান্দার মুক্তি প্রাপ্তির সম্পূর্ণ নির্ভর শুধু আল্লাহতায়ালারই কৃপা ও রহমত ঠিকই তবে কথা হল বান্দা না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের আনুগত্য ও ইবাদত দ্বারা নিজেকে আল্লাহর কৃপা ও রহমতের উপযুক্ত করে তুলে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর কৃপা ও রহমত তার প্রতি বর্ষিত হয় না। এ কথা আমি নিজের তরফ থেকে বলছি না। বরং এ সম্পর্কে খোদ আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন যে- ইন্না রাহমাতাল্লাহে কারীবুম মিনাল মুহছিনীন। অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত নেককারদের নিকটবর্তী। অত্র কালাম দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে আমল ও দুস্কৃতিকারীদের কাছে আল্লাহর রহমত পৌঁছে না সুতরাং তাদের মুক্তিরও কোন আশা করা যায় না।

প্রকৃত মুক্তির জন্য ঈমান যথেষ্ট নয়

যদি কেহ বলে যে, বান্দার মুক্তির জন্য শুধু ঈমানই যথেষ্ট এজন্য আমলের কোন প্রয়োজন নেই এ কথার জবাবে আমি বলছি যে, স্বীকার করি যে, বেহেশত প্রবেশের জন্য ঈমান যথেষ্ট অর্থাৎ যার দৃঢ় ঈমান যথেষ্ট মজবুত আস্থা রয়েছে সে আল্লাহর মর্জী নিশ্চয়ই বেহেশতে প্রবেশ করবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা হল

যে, তা কখন? আল্লাহতায়লার সুনির্দিষ্ট বিধান অনুসারে মৃত্যুর পূর্বে যদি তার তওবা নছীব না হয় ও বিচারের মাঠে যদি আল্লাহ তাকে ক্ষমা প্রদান না করেন এবং স্বীয় গুনাহর কারণে তার প্রতি বিভিন্ন রকম শাস্তি ও কষ্ট ক্লেশ পৌঁছতে থাকে। তারপর বহু কষ্টে কোন রকমে একান্ত দীন হীন বেশে বেহেশতে প্রবেশ নছীব হলেও তাকে কোন মতে প্রকৃত বেহেশত প্রবেশ বলা যায় কি? কখনই নয়, এটা কোন মতেই প্রকৃত মুক্তি বা প্রকৃত বেহেশত প্রবেশ নয়।

প্রিয় বৎস! এ একটি অতি প্রকাশ্য পরিষ্কার এবং সোজা সরল কথা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কার্য এবং পরিশ্রম না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি বদলা ও বিনিময়ের দাবীদার হতে পার না। মানুষের উচিৎ যেন সে কোন অবস্থায় বা কোন ক্রমেই নিজের প্রয়োজনীয় কার্য থেকে উদাসীন না থাকে। তোমার কাজ তো শুধু তাঁরই আনুগত্য এবং আদেশ পালনে মগ্ন থাকা। এর ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থেকে খালেস মনে ঐ ধ্যানেই লেগে থাকা চাই। সম্মুখে কি হবে বা পরিণামে কি রয়েছে তা নিজের প্রতিপালকের হাতে ছেড়ে দাও।

বনী ইস্রাইল সম্প্রদায়ের এক আবেদ ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে ইবাদত করে আসছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছে হলো, আবেদ লোকটির খলুছিয়তের রূপটি ফেরেশতাগণকে প্রত্যক্ষ করাবেন। অতএব আল্লাহতায়ালা একজন ফেরেশতাকে নির্দেশ করলেন, তুমি ঐ লোকটির কাছে গিয়ে বল যে, তুমি কি জন্য এত কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট ক্লেস বরদাশত করছ তোমার এসব যে কোন কাজে আসবেনা তোমার জন্য দোজখের আযাব নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।

উক্ত ফেরেশতা লোকটির নিকট উপস্থিত হয়ে উল্লিখিত রূপ বক্তব্য প্রকাশ করল। লোকটি ফেরেশতার কথা শুনে জবাব দিল, আমার জন্য দোজখ নির্দিষ্ট আছে না আমার বেহেশত নছীব হবে তা দিয়ে আমার কি প্রয়োজন আছে বল। আমার তো উদ্দেশ্য শুধু কার্যসাধন করা। আর আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও আদেশ পালন করাই হল আমার কাজ। ইহা আমার পক্ষে যতদূর সাধ্য ও সম্ভব আমি করে চলেছি। আর যদি আল্লাহর তাউফীক আমার সঙ্গী থাকে তাহলে

ভবিষ্যতে করে যাব। আমার এ কাজ কবুল করা কি না করা হল শুধু আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি কাদেরে মতলক সর্বশক্তিমান এবং আহকামুল হাকিমীন। যদি তিনি এ অধম ও দুর্বল বান্দার প্রতি কোন নির্দেশ জারী করেন বা কোন কিছু আরোপ করেন তবে কার এমন শক্তি রয়েছে যে তা প্রতিরোধ করতে পারে ?

আগন্তুক ফেরেশতা লোকটির কাছ থেকে বিদায় হয়ে আল্লাহর দরবারে চলে গেল এবং তার কাছে যা কিছু শুনল সব আল্লাহর কাছে বিবৃত করল। তখন আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করে দিলেন, আমার এ বান্দা এত দুর্বল ও সীমিত শক্তির মালিক হয়েও আমার আনুগত্য থেকে বিরত হচ্ছেনা, তখন আমি এত বড় কৃপা ও করুণার মালিক হয়ে কি করে তাকে কৃপা ও করুণা না করে পারি "এশহেদু ইয়া মালায়েকাতী আন্নী ক্বাদ গাফারতু লাহু" সাক্ষী থাক হে আমার ফেরেশতা বৃন্দ। আমি আমার বান্দাকে সম্পূর্ণরূপে মার্জনা করলাম।

হে বৎস। খালেস বান্দার উদাহরণ দেখলে তো। যে কোন বান্দার এ ধরণেরই খালেস সরল ও অকপট কাজে মশগুল থাকা উচিত এবং ভরসা রাখা কর্তব্য স্বীয় মহান প্রভুর উপরে। মনোভাব রাখা উচিত এ ধরণের যে, প্রকৃত মহান মাবুদ আমার কোন কার্যই বিফলে যেতে দেবেন না।

হে আমার প্রিয় বৎস। প্রত্যেকটি লোকের নিজের দৈনন্দিন কার্য সমূহের সর্বদাই হিসাব রাখা উচিত। লক্ষ্য রাখা উচিত যে ভাল কাজ কি এবং সে কতটুকু করল আর মন্দ কাজই বা তার দ্বারা কতটা হয়ে গেল। হযরত রসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন তোমাদের কার্যসমূহের হিসাব হওয়ার পূর্বে তুমি তার হিসাব কর এবং তোমার আমলসমূহ পরিমাপ হওয়ার পূর্বে তুমি তা ওজন কর।

আমলের উপর ভরসা করনা

কার্য সাধন করার পরে কারও মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি করে লওয়া যে, আমি বেহেশতে যাওয়ার যোগ্য হয়ে গিয়েছি এটা নিসন্দেহে গর্ব ও অহমিকা। এসব

খেয়াল আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। আবার মোটেই আমল না করে এরূপ ভরসা যে, আল্লাহ তায়ালার কৃপা ও করুণা বলেই নিশ্চয় আমি মুক্তি লাভ করব। এরূপ করাটি হল একেবারে মূর্খতা এবং আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত নিয়মের বিপরীত আশা করা।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী কারামাল্লাহু অজহাহু এরশাদ করেছেন "মান্ জান্না আন্নাহু বেদূনিল কাদ্দেইয়াছিলু ইলাল জান্নাতি হুয়া মুতাযান্নেন।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা করে যে, পরিশ্রম ও কষ্ট–সাধ্য ব্যতীতই বেহেশতে প্রবেশ করবে, তবে তা হবে শুধু তার ধারণা মাত্র সার এবং সে শুধু কল্পনা রাজ্যের অধিবাসী ছাড়া আর কেউ নয়। আর যে ব্যক্তি কষ্ট–ক্লেশ করে এ ধারণা পোষণ করে যে সে বেহেশতের দাবীদার হয়ে গেছে তবে তার কষ্ট ও পরিশ্রম বৃথাই পর্যবসিত হবে।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) এরশাদ করেছেন যে, "তালাবুল জান্নাতে বেলা আমালিন্ যানবুম মিনায্ যুনুব।" অর্থাৎ আমল ব্যতীত বেহেশতের আকাঙ্খা করা গুনাহসমূহের অন্যতম।

একজন প্রসিদ্ধ বুজুর্গ বলেছেন, "আল হাকীকাতু তারকু মূলাহাজাতিল আমালে লা তারকুল আমালে।" অর্থাৎ প্রকৃত আমল হল আমলের পরিণতির ভাবনা ছেড়ে দেয়া, আমল ছেড়ে দেয়া নয়।

হযরত রসূলে করীম (দঃ) কি পবিত্র ও উত্তম উক্তি করেছেন যে, "জ্ঞানী সে ব্যক্তি যে স্বীয় নফসকে নিজের অনুগত ও ফরমাবরদার বানিয়ে নেয়, পরকালের জন্য কিছু কাজ করে নেয়। আর ভীরু দুর্বল সে ব্যক্তি যে কুরিপুর তাবেদারী করে এবং তা সত্ত্বেও আল্লাহর তরফ থেকে বিভিন্ন রকম আশা আকাঙ্খা করে।"

আমল দ্বারা দুনিয়া লাভ করা

হে প্রিয় বৎস ! এলেম হাসিল তথা বিদ্যার্জন এবং কিতাব পাঠে তুমি দিবা রাত্রি পরিশ্রম করেছ এবং সর্বরকম ক্লেশ সহ্য করেছ। আমি বলতে পারি না যে

এর পেছনে তোমার কোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। যদি উদ্দেশ্য তোমার এই থেকে থাকে যে, তুমি পার্থিব সম্মান ও খ্যাতি লাভ করবে, ধন দৌলত লাভ করে নিজের সঙ্গী সাথীদের চেয়ে সম্মুখে চলে যাবে, সবার শীর্ষে আরোহন করবে তাহলে "ফাওয়াই লুল্লাকা ছুম্মা ওয়াইলুল্লাকা" অর্থাৎ তোমার উপরে আফসুসের ওপর আফসুস্।

আর যদি এলেম হাসিল ও কিতাব পাঠের পিছনে তোমার উদ্দেশ্য এ থাকে যে তুমি শরীয়ত ও দ্বীনে মুহাম্মদীকে জীবিত করবে এবং স্বীয় চরিত্র সংশোধন ও বিশুদ্ধ করবে তাহলে- "তুবা লাকা ছুনানা তুবা লাকা"-অর্থাৎ তোমার প্রতি শত প্রশংসা।

হযরত রসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন, "এশ্ মা সে, তা ফাইন্নাকা মাইয়্যেতূন ওয়া আহবেব বা শে' তা ফাইন্নাকা মূফারেক্কুন্ ওয়া, মাল মা শে তা ফাইন্নাকা তুজযা বিহী।" অর্থাৎ যত দিন ইচ্ছা তুমি বেঁচে লও কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে, একদিন মৃত্যু তোমার নিশ্চয় আসবে। (অর্থাৎ যতদীর্ঘ জীবনই তুমি লাভ করনা কেন একেবারে অমর হতে পারবে না মৃত্যুর কোলে একদিন না একদিন ঢলে পড়তেই হবে।) আর যাকে ইচ্ছা হয় তুমি ভালবাসতে পার কিন্তু এ সুনিশ্চিত যে বিচ্ছেদ একদিন হবেই হবে। অতএব তোমার ভেতর যদি বিন্দু মাত্র জ্ঞানের চিহ্ন থাকে তাহলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাও এবং কাউকে ভালবাসলে তার মধ্যে সৎকর্ম সৎ উদ্দেশ্য জুড়িত করে দাও। তাহলে ভালবাসার পাত্র তোমার জন্য মৃত্যুর পরেও সুসঙ্গীর ভূমিকা পালন করবে এবং তোমার কাজগুলো সৎ ও উত্তম হয়ে তার বিনিময়ও উত্তম এবং সুফলদায়ক হবে।

প্রিয় বৎস! তোমার জন্য বিদ্যা ও জ্ঞান, বাহাসবিতর্ক, চিকিৎসা ঔষধ, বালাগাত, ফাসাহাত, এলমে নজুম, নহু ও ছরফ প্রভৃতি বিষয় গুলি অর্জন করায় মূল্যবান সময় ও প্রিয় জীবনের মুহূর্ত গুলির অপচয় ছাড়া আর কি ফায়দা রয়েছে বল?

কবর পর্যন্ত চল্লিশটি প্রশ্ন

সেই সর্বশক্তিমান সামর্থ্যবান মহান আল্লাহতায়ালার শপথ, আমি হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি প্রেরিত ইঞ্জিল কিতাবে পাঠ করেছি যে মুর্দাকে খটিয়ার উপর স্থাপন করার পর থেকে কবরে শায়িত করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তার কাছে চল্লিশটি প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রথমটি হল, "আবদী ক্বাদ তাহার তা মানজারাল খালকে ছিনীনা ফাহাল তাহহারতা মানজারী? অর্থাৎ হে আমার বান্দা। তুমি তো মানুষের দেখার জিনিস গুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ও সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে আসছ দীর্ঘ দিন ধরে কিন্তু তুমি আমার দেখার স্থানটিকে পরিষ্কার করেছ কি হে? (অর্থাৎ তুমি মানুষকে দেখবার জন্য বাহ্যিক কাজগুলি নিয়েই সদা সর্বদা ব্যস্ত রয়েছে কিন্তু আমি যে দিলের খবর রাখি, অন্তরের গোপন দৃশ্য সদা-সর্বদা আমার চোখে ভেসে উঠে তা পরিষ্কার রাখার জন্য তুমি একটি মুহূর্তও চেষ্টা করেছ কি?)

হে প্রিয় বৎস। আল্লাহতায়ালা প্রতিদিন তোমার অন্তরে বলেছেন, "মা তাছনাউ লেগাইরী ওয়া আনতা মাহফুফুম্ বেখাইরী", অর্থাৎ আমি ছাড়া অন্যের সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক? তুমি যে একমাত্র আমার নিকটই সর্ব দিক থেকে মুখাপেক্ষী। কিন্তু তুমি হলে একেবারেই বধির এসব কথা তুমি কিছুই শুননা এর কিছুই বুঝ না।

আমলহীন এলেম উদ্ভ্রান্তির ন্যায়

হে প্রিয় বৎস। স্মরণ রেখ আমলহীন এলেম নিছক উদভ্রান্ততা ছাড়া আর কিছু নয় আর এলেমহীন আমল হল মাল ও সরঞ্জাম হীনতার মত।

যে এলেম আজ তোমাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয় না এবং আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের দিকে টেনে নিতে অপারগ, সে কাল কিয়ামতে কি

করে তোমাকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাতে সক্ষম হবে? যদি আজ তুমি আমল না কর এবং অতীত জীবনের ভুল-ক্রুটির প্রতি গভীর দৃষ্টি দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ব না কর, তাহলে স্মরণ রেখ, কাল কিয়ামতে নিশ্চয় তোমাকে চিৎকার করতে হবে। কাকুতি মিনতি করতে হবে এবং আবেদন নিবেদন করতে হবে আর বলতে বাধ্য হবে,- ফারজে'না না'মাল ছালেহান" অর্থাৎ (হে প্রভু!) আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন, আমি ভাল কাজ করে আসি। কিন্তু পরিতাপের কথা, জবাবে তোমাকে এক অতি পরিষ্কার এবং সোজা-সরল কথা বলা হবে যে, হে নির্বোধ ! তুমি তো দুনিয়া থেকেই এসেছ! এতদিন পর্যন্ত কি আমল করেছ ভবিষ্যতে যে খুব বেশী করবে বলে ওয়াদাহ করতেছ?

হে প্রিয় বৎস! মৃত্যুর জন্য পুরোপুরি ভাবে প্রস্তুত হয়ে যাও। এ একটি অত্যন্ত খাঁটি এবং সত্য ঘটনা এবং প্রকাশ্য সত্য যে, একদিন অবশ্যই মৃত্যু এসে হাজির হবে এবং অবশেষে নিশ্চয় একদিন তোমাকে কবরস্থানে উপস্থিত হতে হবে। যারা পূর্বেই সেখানে গিয়ে বসবাস করছে, সর্বদাই তারা তোমাদের আগমনের প্রতীক্ষায় রত আছে, সাবধান! সেখানে কখনই কেহ যেন খালি হাতে ও পূণ্য ব্যতীত উপস্থিত না হয়। কারণ তা হবে লজ্জা ও অপদস্থতার কারণ।

হযরত আবুবকর (রাঃ) এরশাদ করেছেন- "হাযিহিল আজছা-দু কাফাসুত্ তুইউরে আও আছতাবালুদ্ দাওয়াব্বে'' অর্থাৎঃ- এ দেহ হয়ত পাখির খাঁচার মত অথবা চতুষ্পদ জন্তুর আস্তাবল খানার ন্যায়। এখন তুমি নিজেই চিন্তা করে দেখ, তোমার অস্তিত্বের মূল্য কতটুকু! যদি মোরগের সাথে তোমাকে তুলনা করা হয় তবে তো যখন তুমি ঢোলের আওয়াজ 'এরজেউ' শব্দ শুনবে তখনই তুমি উড়াল দিয়ে উচ্চতর স্থানে পৌছে যাবে। যেমন বর্ণিত রয়েছে, এযতাররা আরশুর রাহমানে লে মাওতে সাআদেবনে মাআজ (রাঃ) অর্থাৎ হযরত সায়াদ এবনে মাআজ (রাঃ) এর মৃত্যুতে আল্লাহ্‌র আরশে আজীম কেঁপে উঠেছিল। আর যদি তোমার মেছাল চতুষ্পদ জন্তুর মত হয়, তাহলে স্মরণ রেখ তোমার বিলাসিতার সামগ্রীগুলি একদা নিশ্চয় তোমাকে দোজখের আগুনের দিকে টেনে নিবে।

স্বয়ং আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন; "উলাইকা কাল্ আনআমে বালহুম আদ্বাল্লু" অর্থাৎঃ এ সব লোক চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

বর্ণিত রয়েছে হযরত হাসান বছরী (রাঃ) কে একদা শীতল পানি সরবরাহ করা হল, তিনি যখন পানির পেয়ালা হস্তে ধারণ করে তা পান করার ইচ্ছা করলেন, তখন হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে একটি ভীষণ চিৎকার বের হল, এবং তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। যখন তাঁর হুঁশ ফিরে এল, লোকগণ তাঁর কাছে আরজ করল হুযুর কি অবস্থা হয়েছিল? তিনি জবাবে বল্লেন, "যাকারতু উমনিয়্যাতা আহলি ন্নারে হীনা ইয়াকুলুনা লে আহলিল্ জান্নাতে আন্ আফীদু আলাইনা মিনাল মায়ে।'' ভাই, যখন আমি পানির পেয়ালাটি হাতে নিয়ে পানি পান করার ইচ্ছা করলাম, হঠাৎ আমার দোজখীদের সেই চিৎকারের কথা স্মরণ হল-যে তারা যখন বেহেশতী লোকের নিকট আবেদন করবে যে হে ভাই! তুমি আমাদের উপর এতটুকু পানি ঢেলে দাও। এ দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, উল্লিখিত বুজুর্গগণ কোন্ পর্যায়ের লোক ছিলেন। মুমিন লোকদের উচিত, তারা যেন একমুহূর্তের জন্য ও আল্লাহ এবং আখেরাতের কথা ভুলিয়া না যায়।

যদি শুধু এলেমই যথেষ্ট হত

প্রিয় বৎস! যদি তোমার জন্য শুধু এলেমই যথেষ্ট হত এবং আমলের কোন প্রয়োজনই না থাকত তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি ভোর রাত্রের এ আওয়াজ যে, "হাল মিন ছায়েলিন?" অর্থাৎ ওহে কোন কামনাকারী বা আকাঙ্খা প্রকাশকারী কিংবা প্রার্থনাকারী আছে "হাল মিন তায়েবিন'' অর্থাৎ ওহে কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছ কিহে? নাউযুবিল্লাহে এ সকল আওয়াজের কোন অর্থই হত না। অথচ ছহীহ হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন- যখন অর্দ্ধ রাত্র অতীত হয়ে যায় এবং সৃষ্টিজহত শান্তির নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সৃষ্টিজগত্কে সম্বোধন করে বলতে থাকেন, "হাল মিন ছায়েলিন, হাল মিন তায়েবিন, হাল মিন

মুছতাগফেরিন।'' ন্যায় নীতিভাবে বলত যদি আমলের দরকারই না হত তা হলে আল্লাহর এই সম্বোধন বাক্যের কি অর্থ হত এবং এর উদ্দেশ্যই বা কি হত?

বর্ণিত রয়েছে একদা হযরত রসূলে করীম (দঃ)-এর পবিত্র দরবারে কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম হযরত ওমর (রাঃ) এর কথা উল্লেখ করলেন তখন রসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করলেন- "নে'মার রাজুলু হুয়া লাও ইউছাল্লি বিল্লাইলে"। অর্থাৎ সে খুবই উত্তম লোক আহা আরও ভাল হত যদি সে তাহাজ্জুদ নামাজও আদায় করত। অতঃপর তিনি জনৈক সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন-"লা তুকছিরিন্ নাওমা বিল্লাইলে তাদউ ছাহেবাহু ফাকীরান ইয়াওমাল কিয়ামাতে।'' অর্থাৎ রাত্রে অধিক নিদ্রা যেওনা রাত্রে অধিক নিদ্রার অভ্যাস মানুষকে রোজ কিয়ামতে পরমুখাপেক্ষী করে ফেলবে।

তাহাজ্জুদের নামাজ

প্রিয় বৎস! আল্লাহ তায়ালার এ বাক্য- "অ- মিনাল্লাইলে ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফেলাতাল্লাকা'' অর্থাৎ (হে নবী (দঃ)!) রাত্রে নফল শ্রেণীর কিছু পরিমাণ ইবাদাত করে নাও। আর আমল সম্পর্কিত অন্য হুকুম হল, "অবিল আছহারে হুম ইয়াছতাগফেরুনা''। অর্থাৎ খোদাভীরু পরহেজগারগণ রাত্রের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করত। কারণ হল ঐ রাত্রের ইবাদতে যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যেত, এর দ্বারা তা মাফ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার অন্য আয়াত রয়েছে- "অয্‌কুরুল্লাহা যেকরান কাছীরা"। অর্থাৎঃ এবং বেশী পরিমাণে স্মরণ কর। মূলতঃ আল্লাহর দরবারে এরই নাম হল যিকির।

হযরত রসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন- "ছালাছাতু আছওয়াতিন ইউহেববুহুল্লাহু তায়ালা ছাওতুদ্দীকে ওয়া ছাওতুল্লাযী ইয়াক্বরাউল কুরআনা ওয়া ছাওতুল মুছাতগফিরীনা বিল আসহার'' অর্থাৎ তিনটি আওয়াজ আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দনীয়। এক শেষ রাত্রের মোরগের আওয়াজ দুইঃ কোরআন

তেলাওয়াতকারীর কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ তিনঃ এই শেষ রাত্রে তওবা এস্তেছফারকারীর তওবা এস্তেগফারের আওয়াজ।

হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) এরশাদ করেছেন যে, "লিল্লাহে রীহুন তাহুববু ওয়াক্বতাল আছহারে তাহমেলুল আযকারা ওয়াল এস্তেগফারা এলাল মালেকিল জাব্বারে।'' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ বায়ু রয়েছে, যা রাত্রের শেষ প্রহরে প্রবাহিত হয়ে বান্দার যেকের আযকার ও তওবা এস্তেগফারকে আল্লাহর পাক দরবার পর্যন্ত পৌছে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রাপ্ত। তিনি আরও বলেছেন যে, "এয কা-না আউয়্যালুল্লাইলে নাদা মুনাদিমমিন তাহতিল আরশে আলা লেইউক্বীমু আবেদুনা ফা ইয়াকূমূনা ফাইউছাল্লুনা মা শায়াল্লাহু ছুম্মা ইউনাদী মুনাদিন ফী শাত্‌রিল্লাইলে আলা লিইউক্বীমু কানেতুনা ফাইয়াক্বমূনা ফাইউছাল্লুনা ইলাসসাহরে ফা এযা কা-নাস্‌সাহরু ইউনাদী মুনাদিন আলা লিইউকীমু মুস্তাগফেরূনা ফাইয়াকূমূনা ফালইয়াস্তাগ ফেরুনা ফা এযা তালাআল ফাজরু নাদা মুনাদিন আলা লিইউক্বীমু গাফেলূন ফাইয়াকূমুন। মিন মাফরাহিহিম কাল মাওতা নুশেরু মিন ক্বুবূরে হিম।" অর্থাৎ যখন রাত্রের পহেলা প্রহর অতিক্রম করতে থাকে তখন এক ঘোষণাকারী আরশের নিম্নস্থল থেকে ঘোষণা করে। সাবধান! ইবাদতকারীদের জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। তখন আবেদ ব্যক্তিরা জাগ্রত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছানুযায়ী সময় পর্যন্ত তারা ইবাদতে রত থাকে।

অতঃপর মধ্যরাত্রে এক ঘোষণাকারী (ফেরেশতা) ঘোষণা করে। ওহে আল্লাহর আদেশ পালনকারীগণ। তোমাদের এখন জাগ্রত হওয়া উচিত। এ সময় তারা জাগ্রত হয়ে যায় এবং রাত্রের শেষ প্রহর পর্যন্ত নামাজ কালামে মগ্ন হয়ে যায়। তারপর যখন শেষ প্রহর আগমন করে, তখন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে, ওহে এখন ক্ষমাপ্রার্থনাকারীরা জাগ্রত হও। তখন তারা জাগ্রত হয়ে তওবা এস্তেগফার নিমগ্ন হয়ে যায়। তারপর যখন প্রভাত করে, অর্থাৎ সূর্যোদিত হয়ে যায়। তখন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে হে উদাসীন অবহেলাকারীর দল! তোমরা

জাগ্রত হও। তখন তারা আপনাপন শয্যা থেকে এমনভাবে উঠতে থাকে যেন মৃতগণকে তাদের কবর থেকে উঠান হয়েছে।

হে প্রিয় বৎস! হযরত লোকমান (আঃ) এর উপদেশাবলী সারা জগতে প্রসিদ্ধ। তিনি স্বীয় পুত্রকে বহু মূল্যবান উপদেশ দান করেছিলেন। তন্মধ্যকার একটি উপদেশ ছিল-"ইয়া বুনাইয়্যা লাইয়াকুনাদ্দীকো লাইছা মিনকা ইউনাদী ওয়া আনতা নায়েমুন"-অর্থাৎ হে আমার প্রিয় বৎস! সতর্ক হও যেন মোরগ সতর্কতায় তোমাদের অপেক্ষা শীর্ষে চলে না যায়। সে যে শেষ রাতে আল্লাহর স্মরণ করে আর তুমি তো শয্যায় পড়ে শুয়ে থাক।

কোন এক কবি কত সুন্দর বলেছেন-
লাক্বাদ হাতাফাত ফী জুনুহ ল্লাইলে হামামাতুন
আলা গোছানিস সাজারে, ওয়া ইন্নী নায়েমুন
কাযাবতু ওয়া রাব্বিল বাইতে লাও কুনতু আশেকান
লামা ছাবাকাতনী বিলবুকায়ে হামায়েমু
ওয়া আযআমু আন্নী হায়েমুন যু ছাবাবাতিন
লেরাব্বী অ-লা আবকী অ তাবকীলবাহায়েমু

অর্থাৎ দ্বিপ্রহর রাত্রে বৃক্ষশাখায় বসে কবুতর কুল কান্নার ধ্বনি তুলছে কিন্তু পরম পরিতাপের কথা হল যে, আমি শয্যার কোলে পড়ে অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছি। কাবা গৃহের মালিকের শপথ করে বলছি যে, আমি একেবারেই মিথ্যা দাবীদার। যদি আমি প্রকৃতই খাঁটী প্রেমিক হতাম তাহলে কিছুতেই কবুতর কান্নায় আমা অপেক্ষা আগে চলে যেতে পারত না অর্থাৎ তারকান্না আমা অপেক্ষা বেশী হতে পারত না। আমি দাবী তো এই করছি যে, স্বীয় প্রতিপালকের ভালবাসায় আমি আত্মহারা ও উৎভ্রান্ত প্রায়। অথচ অবস্থা এই যে, সামান্য পাখী তাঁর মোহব্বতে ক্রন্দন করছে আর আমি এতটুকু মাত্র ক্রন্দন করি না।

সার কথা হল, তোমার উত্তমরূপে উপলব্ধি করা উচিত যে, আনুগত্য এবং

ইবাদাত কাকে বলে। শুনে নাও আনুগত্য ও ইবাদাত খোদ হযরত রসূলে করীম (দঃ) এর নির্দেশ ও বিধি বিধান পালনেরই নাম। অর্থাৎ যা তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, বা যা তিনি নিজে পালন করেছেন বা যা তিনি নিজে পছন্দ করেছেন, সেগুলো পালন করা আর যা তিনি নিষেধ করেছেন বা যা তিনি না পছন্দ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা। মোটকথা হযরত রসূলে করীম (দঃ) এর প্রতিটি বিধি বিধান ও রীতি নীতির প্রতি মনে আনুগত্য প্রদর্শন ও সেগুলোকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করাকেই বলা হয় এতাআত ও ইবাদাত।

যদি তোমরা কোন কার্য হযরত শারে (আঃ) এর রীতি-নীতির বিপরীত কর, যদি তা প্রকাশ্যে বা বাহ্যতঃ ইবাদতের অনুরূপ বা তার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণও হয় প্রকৃত পক্ষে তা আনুগত্য ও ইবাদা,ত নয় বরং গুনাহ এবং অবাধ্যতা। দেখ নামাজ কত বড় উত্তম ইবাদত। কিন্তু আমরা যদি নিষিদ্ধ ওয়াক্তে অথবা জবরদখলকৃত জমিনের উপর নামায আদায় করি তা হলে ইবাদাতের বদলে গুনাহর কার্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

এভাবে দেখ রোজাও একটি কতবড় ইবাদতের কার্য কিন্তু যদি আমরা ঈদ অথবা আইয়্যামে তাশরীকে তা' আদায় করি তাহলে তা' একটি বড় গুনার কার্যে পরিণত হয়ে যায়। আবার দেখ খেল তামাসা কত বড় খারাপ জিনিস কিন্তু যদি আমরা নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে তার প্রাপ্য আদায় ও তাকে খুশী করার জন্য করে থাকি তাহলে তা' এক মস্ত বড় পুণ্য ও ছওয়াবের কাজে গণ্য হয়ে যায়। কিন্তু এসব কেন? এর জবাব হল এ ধরণের কাজগুলো করা হল নির্দেশ ও নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা তার অনুরূপ ও অনুকূল।

উপরোক্ত উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল যে, যে কোন ইবাদাতের সার্থকতা ও সুষ্ঠুতার মূল ভিত্তি হল নির্দেশ পালন ও তদনুরূপ কার্য করা। তার বাহ্যিক রূপ যাই হোক না কেন। নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাত প্রভৃতিও এমতাবস্থায় ইবাদাত যখন তা নির্দেশ ও বিধানের অনুরূপ হয় আর যদি তা না হয় তাহলে তা জান-প্রাণের জন্য আযাব ও দুঃখের কারণ ছাড়া আর কিছু নয়।

অতএব হে প্রিয় বৎস! তোমার সমস্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা চাল ও চলন নির্দেশ বিধানের অনুরূপ হওয়া একান্তই আবশ্যক। সর্বাবস্থায় ও সর্বভাবে নিজে নিজেকে শরীয়তের অনুবর্তী ও বাধ্যগত রাখা অপরিহার্য্য। প্রিয় বৎস। স্মরণ রেখ। এই এলেম ও আমল অথবা সেই স্বভাব ও চরিত্র যা হযরত শারে (আঃ) এর মর্জীর বিপরীত তা সমস্তই গোমরাহী ও আল্লা জাল্লা শানুহু থেকে দূরবর্তী হওয়ার কারণ। তোমার উচিত, প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসেও যেন আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ এবং বিধি বিধান অক্ষুন্ন থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

প্রিয় বৎস। নিশ্চয় জেন, যা কিছু এলেম তুমি অর্জন করেছ তা সমস্ত আমল এবং মোজাহাদা বিহীন নিরর্থক, এবং উহা সোজা সরল রাস্তা প্রাপ্তির জন্য সহায়ক নয়। ঠিক এ ভাবেই সুফীদের ভ্রান্ত নিরর্থক রেওয়াজসমূহও সিরাতুল মুস্তাকিম অতিক্রমের পক্ষে অন্তরায় বটে। এ পথ রক্ত সংযম সাধনার তলোয়ার দ্বারা প্রবাহিত করতে হয়। শুধু সুফীয়ানা চালদ্বারা কোন কিছু হয না। অহেতুক বেকার কথাবার্তা দ্বারা জীবন নফসের অনুবর্তীতায় বেঁধে ফেলা দুর্ভাগ্যের নিদর্শন। যতদিন পর্যন্ত নফসে আম্মারাহ শরয়ী ইবাদত ও আনুগত্যের দ্বারা জব্দ এবং প্রভাবান্বিত না হবে ততদিন পর্যন্ত নূরে মারেফাত দ্বারা হৃদয়ের নবজীবন লাভ কোন মতেই সম্ভব হতে পারে না।

আধ্যাত্মিক বস্তু কথাবার্তা দ্বারা বুঝা যায় না

হে প্রিয় বৎস। তুমি কতিপয় মাসলা প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছে তন্মধ্যে কতিপয় তো এমন যার জবাব মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রদান সম্ভব নয়। ওগুলি অতি উর্দ্ধের বিষয়। যখন তুমি সে পরিমাণ উর্দ্ধস্তরে আরোহন করবে, তখন সেগুলি তোমার নিকট আপনা থেকে প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং যতদিন পর্যন্ত তুমি উক্ত স্তরে পৌছাতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত তা উপলব্ধি করার শক্তি ও সামর্থ অর্জন করতে পারবে না। এ বিষয়গুলি ভাবাবেগ ও আধ্যাত্ম বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবস্থা ছাড়া এ বিষয়গুলি ভাবাবেগ ও আধ্যাত্ম বিষয়ের সাথে

সম্পর্কযুক্ত। অবস্থা ছাড়া এ বিষয়গুলি বুঝা ও অনুধাবন করা একেবারে অসম্ভব। ওর স্বাদ ও মজা কেবল সেই উপরব্দি করতে পারে যে সে স্বাদ ও মজাকে স্বীয় জিহবা দ্বারা উপভোগ করেছে এসব কথা না লিখে বুঝানো চলে, না মুখে বলে বুঝানো চলে। মিষ্ট না তিক্ত তা কোনদিন নিজে উপভোগ করে দেখেনি, সে তার নিজের মুখের কথার দ্বারা বা নিজের লিখিত বক্তব্য কোন প্রকারেই ঐ বস্তুটির স্বাদ কাউকে বুঝাতে পারবে না।

হে প্রিয় বৎস! যদি কোন জন্মগত নপুসক ব্যক্তি এমন একটি লোককে যে সংগমসুখ অনুভব করেছে জিজ্ঞাসা করল যে, হে ভাই বলত স্বামী স্ত্রীর সংগম সুখের স্বাদটি কিরূপ। এখন বৎস তুমিই বলনা ঐ জিজ্ঞাসিত লোকটি কোন প্রকারে কি তাকে সংগম সুখের স্বাদের পরিচয় দিতে পারবে ? কিছুতেই পারে না এ প্রশ্নের তো শুধু এমত একটি জবাবই দেয়া যেতে পারে যে, ভাই এ এক পরমাশ্চর্যকর ও অবর্ণনীয় অবস্থা ও অভানীয় সুখকর স্বাদ। তা আমি তোমাকে কি করে বুঝাবো? যখন তুমি কোন স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম ক্রিয়ায় সক্ষম হবে তখন তুমি আপনা থেকেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, সঙ্গম সুখের সে পরমাশ্চর্য স্বাদটি কিরূপ।

এভাবেই তোমার কতিপয় জিজ্ঞাস্য বিষয় এরূপ যে, কোন প্রকারেই তার জবাব বুঝিয়ে বলা যায়না। যখন উপযুক্ত স্থানে উপনীত হবে নিজেই সে বিষয়ের স্বাদ উপলব্ধি করবে তখন আপনা থেকেই অনুভব করতে পারবে যে তার স্বাদ ও মজা কি ধরণের। অবশ্য তোমার প্রশ্নগুলির যে অংশের জবাবগুলো মুখে বলে ও লিখে প্রকাশ করা যায় তা বিস্তারিতভাবে এহইয়াউল গ্রন্থে ও আমার লিখিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহে দেখতে পাবে। অত্র ক্ষুদ্র পত্রে তা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। অবশ্য সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত প্রদান হিসাবে সামান্য কিছু বিবৃত করছি।

তুমি একটি প্রশ্ন করেছ যে খোদার পথের পথিকদিগের প্রতি কি কি অবশ্য করণীয়। এর জবাব নিম্নে উল্লিখিত হল।

ছালেকের প্রতি ওয়াজেব কি

ছালেক বা আল্লাহর পথের পথিকদের প্রতি ওয়াজেব বা অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহের প্রথমটি হল এমন দৃঢ় ও নিখুঁত আকীদা বজায় রাখা যার ভেতরে কোন বেদয়াতের গন্ধও না থাকা। দ্বিতীয়টি হল, এমন খালেছ ও খাটি তওবা করা যে, পুনরায় গুনাহের ধারে কাছে যাওয়ার খেয়াল পর্যন্ত না করা। তৃতীয়টি হল, শত্রু মিত্রের সাথে এমন আচরণ প্রদর্শন করা যে, তাদের কারও কোন রূপ নাখোস হওয়ার অবকাশ না থাকে। চতুর্থটি হল, দ্বীনি এলেম এই পর্যন্ত অর্জন করা যে ভালমন্দ ও সিদ্ধ অসিদ্ধ সম্পর্কে পুরাপুরি জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায় এবং শরীয়তের হুকুম আহকাম সঠিক ভাবে পালন করতে পারে। এর থেকে বেশী এলেম হাসিল করা ছালেকের জন্য ওয়াজেব ও বাধ্যতামূলক নয়।

কোন এক শায়েখ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত শিবলী নো'মানী (রহঃ) বলেন যে, আমি চারশত ওস্তাদের সাহচর্যে থেকে তাদের নিকট থেকে চল্লিশ হাজার হাদীস আমার আমল দূরস্ত করার জন্য নির্বাচিত করলাম। কারণ চিন্তাকরে দেখলাম স্বীয় মুক্তি এবং রেহাইর জন্য সেই একমাত্র হাদীছই যথেষ্ট। হাদীসটি নিম্নে উল্লিখিত হল।

"এ'মাল লেদুনিয়াকা বেকাদরে মাকামেকা ফীহা অ আ'মাল লিল্লাহে বেকাদরে হাজাতেকা ইলাইহে ওয়া আ'মাল লিন্নারে বেবাদরে ছাবরেকা আলাইহা।" অর্থাৎ দুনিয়ার জন্য তুমি এতটুকু মাত্র কাজ কর, যতটুকু সময় তুমি সেখানে বসবাস করবে তার হিসাব করে, আর পরকালের কাজ কর তথায় তোমার কাল যাপনের হিসাব অনুযায়ী এবং আল্লাহর কাজ কর তুমি যে পরিমাণ তুমি আল্লাহর মুখাপেক্ষী তার প্রতি লক্ষ্য করে। এছাড়া দোজখে যাওয়ার মত কাজ কর এই পরিমাণ যে পরিমাণ দোজখের আযাব তুমি সহ্য করতে পার। হে বৎস ! হাদীসটির উক্তি কতখানি ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছ।

যদি আমলের জন্য এই শ্রেণীর মাত্র একটি হাদীসকে পথের দিশারী করে নেয়া হয় তবে আর কিছুই বাকী থাকে না অন্য কোন কিছুরই প্রয়োজন করে না।

প্রিয় বৎস! এবার আশা করি তুমি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছ যে, তোমার কোন বিরাট আলেম বা খ্যাতনামা আল্লামা হওয়ার প্রয়োজন নেই। এরূপ আলেম বা আল্লামা হওয়া ফরজে কেফায়া মাত্র ফরজে আইন নয়।

তেত্রিশ বৎসরে মাত্র আটটি কথা শিখা

হযরত হাতেম আছাম (রহঃ) এর নিকট একদিন তাঁর বুজুর্গ ওস্তাদ হযরত শাফীক (রহঃ) জিজ্ঞেস করলেন যে, হাতেম। তুমি আমার সাহচর্যে এই কত বছর ধরে বসবাস করছ? তিনি জবাব দিলেন, হুযুর। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে আমি আপনার দরবারে অবস্থান করছি।

ওস্তাদ বল্লেন, আচ্ছা বলত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তুমি আমার থেকে কতটুকু শিক্ষা এবং কিরূপ উপকার লাভ করেছ?

তিনি বল্লেন, হযরত! মাত্র আটটি বিষয় শিক্ষা লাভ করেছি।

হযরত শাফীক (রহঃ) এরূপ জবাব শুনে যারপরনাই পেরেশান হয়ে পাঠ করলেন- "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।" অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয় আমি তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব। অতঃপর তিনি বললেন, মিয়া! তুমি বল কি। অত্যন্ত পরিতাপের কথা আমি তোমার শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আমার সমগ্র পরিশ্রম এবং সারাটি জীবন ব্যয় করলাম, আর তুমি কিনা বলছ যে, আমার নিকট থেকে তুমি মাত্র আটটি বিষয় শিক্ষা লাভ করেছ। আফসুসের কথা, এ শত আফসুসের কথা।

হযরত হাতেম (রহঃ) আরজ করলেন, হুযুর! যদি শুনতে চান তবে সত্যিই বলতে হয় আমি আপনার কাছ থেকে এতদিনে শুধু অতটুকু জ্ঞানই অর্জন করেছি এবং ওর দ্বারাই আমি গৌরব বোধ করতেছি। আর এরচেয়ে বেশী কিছু

শিক্ষা করার আমার আকাঙ্খাও নেই। আল্লাহ্র মর্জী এই শিক্ষাই আমার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য যথেষ্ট হবে।

এবার হযরত শাফীক (রহঃ) বল্লেন, আচ্ছা এবার বলত, যে শিক্ষাটুকুর দ্বারা তুমি এতটা গৌরব বোধ করতেছ তা কোন্ আটটি বিষয় ! যা শিক্ষা করার পর তোমার আর কিছু শিক্ষা লাভ করার আকাঙ্খা মাত্র নেই।

হযরত হাতেম (রহঃ) বল্লেন, সে আটটি বিষয়ের প্রথম হল, যখন আমি দুনিয়াদারদের দিকে দৃষ্টি প্রদান করলাম, তখন দেখতে পেলাম, তারা প্রায় প্রত্যেকেই দুনিয়ার কোন না কোন এক বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট ও আসক্ত। যখন এ ব্যাপারে আমি সুক্ষ্ম চিন্তা ভাবনা করলাম তখন আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে এদের কেহই দুনিয়াদারদের উত্তম বন্ধু বা হিতৈষী নয়। এদের কেহ কেহ হয়ত তাদের মৃত্যু রোগ পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। কেহবা হয়ত একটু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বড় জোর কবর পর্যন্ত পৌছে তারপর তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে। এ দৃশ্য অবলোকন করে আমি নিজের জন্য এমন এক বন্ধুর অন্বেষনের ভাবনায় নিযুক্ত হলাম যে কবরের মধ্যেও আমার বন্ধু হিসাবে সঙ্গে থাকবে এবং পরকালেও আমার শুভাকাঙ্খী হবে। চিন্তা ভাবনা ও খোঁজ তালাশের পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, নেককাম বা উত্তম কার্য ব্যতীত কোন উৎকৃষ্ট ও উত্তম বন্ধু নেই, যে শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গী হিসাবে সহায়তা দান করবে। অতএব আমি সেই সৎকার্যকেই নিজের বন্ধু ও প্রিয় হিসাবে গ্রহণ করলাম।

এ পর্যন্ত শ্রবণ করে হযরত শাফীক (রহঃ) বল্লেন, "আহ্সান্তা"। অর্থাৎ হে হাতেম! তুমি খুবই ভাল কাজ করেছ।

অতঃপর হযরত হাতেম (রহঃ) আরজ করলেন, হুযুর! আমার দ্বিতীয় শিক্ষাটি হল, যখন আমি দুনিয়াদারদের প্রতি তাকালাম তখন সবাকেই নিজ নিজ রিপুর বাধ্যগত দেখতে পেলাম। কিন্তু যখন আমি এই পবিত্র আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম "অ আম্মা মান খা-ফা মাক্বামা রাব্বিহী ওয়া নাহান নাফসা আনিল হাওয়া ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া।'' অর্থাৎঃ এবং যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে দাঁড়াবার ভয় করে নিজের রিপু সমূহকে লোভ লালসা

থেকে বিরত রাখল তবে নিশ্চয় তার ঠিকানা বেহেশত মধ্যে হবে। এ পর্যন্ত বলে সে হঠাৎ আপনা থেকে চিৎকার করে বলে উঠল, পবিত্র কোরআন সত্যের প্রতি প্রতিষ্ঠিত। (এ জন্য যে প্রকৃত ঘটনা হল রিপু আমাদের অনুগত ও আদেশ মান্যকারী, আমরা তার অনুগত ও আদেশ মান্যকারক নই। সুতরাং কদাচারী নফসের বিরুদ্ধে আমি জিহাদ শুরু করেছি এবং তাকে বাধ্যতার যাঁতা কলে এমন ভাবে নিস্পেষন করছি যে, তার দম বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আর এখন তার অবস্থা এমন হয়েছে যে বিনা বাক্য ব্যয়ে ও নির্দ্বিধায় সে আমার নির্দেশ পালক সেজেছে।

হযরত শাফীক (রহঃ) বল্লেন,-"ইয়া বারাকাল্লাহু আলাইকা'' অর্থাৎ হে হাতেম! আল্লাহ তোমার উপরে বরকত দান করুন।

হযরত হাতেম (রহঃ) আরজ করলেন, হুযুর! তৃতীয় বিষয়টি হল, যখন আমি দুনিয়াদারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম। দেখলাম প্রায় সবাই ধন দৌলত অর্জন করতে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে এবং তারা কোন সামান্য পার্থিববস্তু লাভ করেই আনন্দিত হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন আমি অত্র আয়াতে করীমার দিকে দৃষ্টি করলাম যে, "মা এনদাকুম ইয়ানফাদু অ-মা এনদাল্লাহে বাক্বিন'' অর্থাৎ যা কিছু তোমার নিকট আছে সব শেষ হয়ে যাবে এবং যা কিছু আল্লাহর নিকট আছে, তা চিরকাল থাকবে। তখন দীর্ঘ দিনের জমাকৃত সমস্ত ধন সম্পদ আল্লাহর পথে গরীব দুঃখীদেরকে বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে জমা করে রাখলাম। এ আশায় যে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এসব সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে। এবং পরকালে এর দ্বারা মুলধনের কাজ হবে।

হযরত শাফীক (রহঃ) বল্লেন, হে হাতেম! বহুত আচ্ছা, তুমি অত্যন্ত উত্তম কাজ করেছ।

হযরত হাতেম (রহঃ) আরজ করলেন, চতুর্থ বিষয়টি হল, আমি দুনিয়াদারদের প্রতি তাকিয়ে তাদের মধ্যে কাউকে দেখলাম, তারা নিজেদের বংশ গৌরব ও মান মর্যাদায় সীমাহীন বড়াই করছে। কাউকে দেখলাম, নিজের শক্তি সামর্থ ও ক্ষমতাকে নিজের মানসম্মান মর্যাদার ভিত্তি মনে করছে। মোট

কথা মান মর্যাদার ব্যাপারে একেকজন আপনাপন খেয়ালানুযায়ী একেক বস্তুকে আসল জিনিস মনে করে বসেছে। কিন্তু যখন আমি অত্র আয়াতে কারীমার প্রতি তাকালাম যে, 'ইন্না আকরামাকুম এনদাল্লাহে আতকাকুম' অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খোদাভীরু। তখন আমার নিকট প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। তারপর আমি নিজে নিজের উপরে পরহেজগারী ও খোদাভীরুতা ওয়াজিব করে নিলাম যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমার সম্মান ও মর্যাদা লাভ হয়।

হযরত শাফীক (রহঃ) বল্লেন, 'আহসানতা'– অর্থাৎ তুমি অতি উত্তম কাজ করেছ হাতেম!

হযরত হাতেম (রহঃ) বল্লেন, হুযুর! পঞ্চম বিষয়টি হল, আমি দুনিয়াদারকে দেখলাম তারা প্রায় সকলেই পরস্পরের দোষ–ত্রুটি বর্ণনা করছে। আমি ভাবতে লাগলাম যে, এর কারণ কি? গভীর চিন্তা দ্বারা বুঝা গেল যে, এর একমাত্র কারণ হল পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ। তারপর যখন আমি আয়াতে কারিমা পাঠ করলাম যে, "নাহনু কাছামনা বাইনাহুম মাঈশাতাহুম ফিল হায়াতিদ্দুনইয়া–'' অর্থাৎ আমি তাদের পার্থিব জীবনের উপজীবিকা তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি। তখন আমি বেশ করে বুঝলাম যে, এসব লোকেরা শুধু নিরর্থকই পরস্পর হিংসা পোষন করছে। প্রতিটি লোকের অংশ তো রোজে আজল থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশই লাভ করছে। বন্টনকারী যখন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তখন হিংসা করায় কোন্ স্বার্থ রয়েছে? সুতরাং এখন আমি আল্লাহ প্রদত্ত অংশের উপরই রাজী হয়ে গেছি। এবং এখন আমার আর কারও সাথে হিংসা বিদ্বেশ নেই এবং তার কোন প্রয়োজনও নেই (বরং) এখন আমার দুনিয়ার সবার সাথেই হৃদ্যতা ও সুসম্পর্ক বর্তমান।

হযরত শাফীক (রহঃ) বল্লেন, হে হাতেম। তুমি অতি উত্তম কাজ করেছ।

হযরত হাতেম (রহঃ) আরজ করলেন, ষষ্ঠ বিষয়টি হল যে, যখন আমি দুনিয়াদারদের প্রতি তাকালাম তখন দেখলাম তারা পরস্পর শত্রুতাচরণে লিপ্ত

রয়েছে, কোন কারণ বশতঃ এরা একে অপরের শত্রু হয়ে যাচ্ছে অতঃপর তারা সর্বদাই একে অপরের ক্ষতি, নোকসান এবং অপদস্থতার চিন্তায় লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু যখন আমি অত্র আয়াতে কারীমার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করলাম যে, "ইন্নাশ্‌শায়তানা লাকুম আদুয়্যুন ফাত্তাখেযুহু আদুয়্যান।'' অর্থাৎ "নিসন্দেহে শয়তান তোমাদের শত্রু। তোমরাও তাকে শত্রু মনে করে নাও।" তখন আমার জ্ঞানের চক্ষু উন্মুক্ত হল এবং আমি বুঝতে পেলাম যে, আমার প্রকৃত শত্রু কে? সুতরাং আমি তার প্রতিটি কথারই বিরোধিতা শুরু করলাম। এবং প্রতিটি মুহূর্তে আমি তার দুর্ণাম ও কুৎসা প্রচার করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলাম এবং স্বীয় প্রতিপালকের উপাসনা ও তার আদেশ পালনে পুরাপুরিভাবে মগ্ন হয়ে গেলাম। আমি বদ্ধমূল ধারণা করে নিলাম যে, সোজা ও সরল পথ হল এটাই, যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কালামে মজীদে এরশাদ করেছেন– "আলাম আ'হাদ ইলাইকুম ইয়া বানী আদামা আল্লা তা'বুদুশ্ শাইতানা ইন্নাহু লাকুম আদুয়্যুম মুবীন, ওয়া আনি'বুদুনী হা–জা ছিরাতুম মুছতাকীম।'' অর্থাৎ হে আদমের আওলাদগণ! আমি কি তোমাদেরকে সাবধান করে দেইনি যে, শয়তানের অনুবর্তী হয়োনা যেহেতু সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। বরং তোমরা আমার বাধ্যগত হও এটাই হল সোজা–সরল পথ। (হে আমার প্রভু। নিশ্চয় আপনি পথ বাতলিয়ে দিয়েছিলেন, স্বীয় কৃপা ও করুণার দ্বারা আপনি আপনার আদেশ পালনের উপরে বহাল রাখুন এবং এর উপরই আমাদের মৃত্যু প্রদান করুন।

হযরত শাফীক (রহঃ) বল্লেন, হে হাতেম! তুমি অতি উত্তম কাজ করেছ।

হযরত হাতেম (রহঃ) আরজ করলেন হুযুর। ৭ম বিষয়টি হল, আমি দুনিয়াদারদে প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে তাদের সবাকেই রুজী রোজগার তথা উপজীবিকা উপার্জনের জন্য ব্যতিব্যস্ত ও অস্থির দেখতে পেলাম রুজী রোজগারে ব্যাপারে সবাইকে অধৈর্য্য ও অদ্বিগ্ন দেখা গেল। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এরশাদ হল,– অ–মা–মিন দা–ব্বাতিন ফিল আরদে ইল্লা আলাল্লাহে রেজকুহা" অর্থাৎ জগতে এমন কোন জীব নেই যার রুজীর যিম্মাদার আল্লাহ তায়ালা নন।

অতএব আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি দৃঢ় বিশ্বাস করে নিলাম যে, রুজী

পৌঁছানোর যিম্মাদারী আল্লাহরই উপর ন্যাস্ত। সুতরাং আমি রুজীর ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে প্রকৃত প্রভুর ইবাদত ও আদেশ পালনে আত্মনিয়োগ করলাম।

হযরত শাফীক (রহঃ) বল্লেন, উত্তম তুমি খুব উত্তম কাজ করেছ।

হযরত হাতেম (রহঃ) বল্লেন, হুযুর। ৮ম বিষয়টি হল, যখন আমি দুনিয়াদারদের প্রতি লক্ষ্য করলাম তখন দেখলাম তারা প্রত্যেকেই (আল্লাহ ব্যতীত) কোননা কোন এক ব্যক্তি বা বস্তুর উপর নির্ভরশীল। কেহবা নিজের দৌলতের উপর নির্ভরকারী, কেহবা নিজের স্থাবর সম্পতির উপর ভরসাকারী, কেহবা নিজের পেশা কিংবা, চাকুরী ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে বসে আছে। কেহবা নিজের অনুরূপ কোন সৃষ্ট জীবের উপর ভরসা করে চলছে। কিন্তু যখন আমি অত্র আয়াতে কারীমা পাঠ করলাম যে, "অ-মাইয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহে ফাহুয়া হাছবুহু" অর্থাৎ যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার উপর ভরসা করেছে তবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। যথেষ্ট, অতঃপর আমি সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু স্বীয় প্রতি-পালকের উপরই ভরসা করলাম, "অহুয়া হাসবী ওয়া নে'মাল ওয়াকীল, -অর্থাৎ তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং কত উত্তম কার্য সাধনকারী।

হযরত শাফীক (রহঃ) বল্লেন, হে হাতেম। তুমি উত্তম কাজ করেছ। অ-ফ্ফাকাল্লাহু তায়ালা অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে এ কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দান করুন। আমি তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও আল্লাহর কোরআন এ চার কিতাব অধ্যয়ন করেছি। এসবের উপদেশাবলীর সারমর্মও এই আটটি বিষয়। যে ব্যক্তি এ আট বিষয়ের উপর আমল করে, সে যেন আল্লাহর চার কিতাবের উপরই আমল করল।

হে প্রিয় বৎস। এ ঘটনা দ্বারাও তুমি বুঝতে পারলে যে, তোমার খুব বেশী এলেম শিখার প্রয়োজন নেই। বরং আসল উদ্দেশ্য হল শুধু আমল করা।

ছালেকের জন্য যে বিষয়ের প্রয়োজন; তন্মধ্যের চারটি তো বর্ণিত হয়েছে। এখন পঞ্চমটির কথা শুন।

ছালেকের জন্য একজন মুরুব্বী প্রয়োজন

ছালেকের জন্য একজন মুরুব্বী এবং মোরশেদ থাকা একান্ত জরুরী যিনি তার থেকে কুস্বভাব ও কদর্য চরিত্র দূর করে দিবেন, এবং নেক কাজ ও উত্তম চরিত্রের অভ্যাস সৃষ্টির জন্য ধীরে ধীরে চেষ্টা করতে থাকবেন, আর এ ধরণের শিক্ষা প্রদান করবেন যে ক্রমে ক্রমে শরীয়তের তাবেদারী, সদাচরণ তার অভ্যাসে পরিণত হবে, এবং তার মধ্যে অন্য ধরণের চরিত্র সৃষ্টি হবে।

মোরশেদের উদাহরণ হল এক কৃষকের ন্যায়, কৃষক যেমন কৃষিখেতের দেখা শুনা করে, খেত থেকে পাথর কঙ্কর ঝাড় জঙ্গল দূর করে ফেলে এবং সাধ্যমত তাকে সর্বরকম অপকার থেকে রক্ষা করে, ফলে ক্ষেতের ফসল সকল বিপদ থেকে নিরাপদ থেকে ফুলে ফলে খুশোভিত হয় এবং উত্তম ফসল দান করে।

ঠিক এভাবে মোরশেদ ব্যক্তিও সালেক বা তার শিষ্যকে দেখা শুনা ও রক্ষণা-বেক্ষণ করে। যেভাবে একখানি খেত রক্ষক ব্যতীত পুরোপুরি ভাবে লাভ জনক হয়না, শষ্য শ্যামল ভূমিতে পরিণত হতে পারে না এবং সর্বদাই তাতে ক্ষতি ও অপকারের সন্দেহ লেগে থাকে। ঠিক এভাবেই একজন সালেক মোরশেদ ব্যতীত উদ্দেশ্য সফলে সক্ষম হয় না। বরং প্রতি পদে পদে ভয়ানক অপকার ও দুর্যোগ দ্বারা বিনষ্ট হবার আশংকা বজায় থাকে। সুতরাং সালেকের জন্য জনৈক মোরশেদ থাকা একান্ত আবশ্যক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র নবী রসূল (আঃ) কে এবং সর্বশেষ দোজাহানের সরদার হযরত রসূলে মকবুল (দঃ) কে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, আল্লাহর বান্দাগণকে সোজা পথ দেখাবে এবং তাদেরকে অধর্ম অনাচার থেকে বাঁচাবে যখন হযরত রসূলে করীম (ছঃ) চির বিদায় গ্রহণ করলেন, তখন এ সকল কাজ ও দায়িত্ব তাঁর খলীফা এবং প্রতিনিধি গণের প্রতি অর্পিত হল, এবং আল্লাহর মর্জী এরূপ ধারা কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

মুরব্বী ও মোরশেদ কিরূপ চাই

সালেকের এমন মোরশেদের প্রয়োজন যে হযরত রসূলে করীম (দঃ) এর খেলাফত এবং প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন একজন পীর বা মোরশেদের জন্য আলেম হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এ জরুরী নয় যে, প্রত্যেক আলেমই পীর বা মোরশেদ হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হয়। এ ব্যাপারে যোগ্য হওয়ার কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে এখানে তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা যাচ্ছে যেন প্রত্যেকেই পীর মোরশেদ হওয়ার দাবী করতে না পারে। সালেকের উচিত, মোরশেদকে এ সব নিদর্শনের মাপকাঠিতে বিচার করে নেওয়া। তারপর তাকে নিজ মোরশেদ হিসাবে বরণ করে লওয়া। উক্ত নিদর্শন ও গুণ সমূহ নিম্নে উদ্বৃত হল।

মোরশেদের অন্তরে ধন–সম্পদ এবং মান–সম্মানের কামনা মোটেই থাকবে না, তাছাড়া সে নিজে এমন দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির মুরীদ হবে যা ধারা দিব্যজ্ঞান সম্পন্নদের মাধ্যমে হযরত রসূলে করীম (দঃ) পর্যন্ত উপনীত হয়েছে। সর্বপ্রকার আত্মিক মোজাহেদা ও সাধনার স্তর অতিক্রম করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ কম খাদ্য খাওয়া, অল্প নিদ্রা যাওয়া, কম কথা বলা, অধিক নামায পড়া, বেশী পরিমানে রোযা রাখা, অধিক দান খয়রাত করা, ছবর, শোকর, তাওয়াক্কুল, দৃঢ়তা, দেলী ধীরস্থিরতা, ছাখাওয়াত, কানায়াত, আমানাত, মাল খরচ, ধৈর্য, বিনয়, সততা, বুদ্ধিমত্তা, অবিচলতা, শরম, গাম্ভীর্য প্রভৃতি উত্তম স্বভাব সমূহ তাঁর মধ্যে বজায় থাকতে হবে। লোভ লালসা, অহমিকা, কৃপণতা, রিয়া প্রভৃতি অসৎ স্বভাব সমূহ থেকে তার অন্তর পবিত্র হতে হবে। সোজা সরল রাস্তা থেকে দূরে নিক্ষেপ করার যে কোন এলেম থেকে মুখ ফিরিয়ে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর এলেমের প্রতি আকৃষ্ট হতে হবে। যে কোন অবস্থায় শরীয়তের মজবুত অনুসারী হতে হবে। যে কোন প্রকার বেদায়াতের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী এবং সুন্নতে নবুবীর প্রতি মহব্বতকারী হতে হবে।

উল্লিখিত নিদর্শণ সমূহ আখলাক ও আলামাতে মোরশেদ থেকে কতিপয় মাত্র। এই ধরনের মোরশেদ ধারন করা ছওয়াব ও পুণ্য লাভের নিশ্চিত কারণ

বটে। আর তাঁর সাহচর্য্য আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নেয়ামত সমূহের অন্যতম নেয়ামত। এই ধরনের যোগ্য মোরশেদ অত্যন্ত কমই দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের এ, যুগে তো এমন বহু পীরত্বের দাবীদার রয়েছে, তারা ও তাদের এ দাবী একেবারেই অমুলক ও নিরর্থক বটে। এরা নিজেদের শিস্যগণকে খেল–তামাসার দিকে আহবান করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ যে, শরীয়তের গন্ডিচ্যুত হয়ে আল্লাহর সৃষ্টিকে গোমরাহ করে ফেলছে। এর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মোরশেদ হওয়ার যোগ্য, সে ফেতনা–ফাসাদ থেকে সরে গিয়ে নির্জনে লোক চক্ষুর অন্তরালে গা ঢাকা দিয়ে বসেছে। (প্রিয় পাঠকগণ। হযরত ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) যুগটির প্রতি লক্ষ্য করুন। যখন সে যমানার দৃশ্যই এরূপ, তখন আমাদের যমানার অবস্থার কথা আর কি বলা যায়। আল্লাহ আমাদের এ যুগের দুরাবস্থা থেকে তিনি আমাদেরকে মুক্ত রাখুন।)

আদাবে মোরশেদ বা পীরের প্রতি আচরণ রীতি

যে ব্যক্তি উল্লেখিত রূপ নিদর্শন ও গুণাবলিসম্পন্ন মোরশেদ লাভ করবে, এবং যে মোরশেদ তাকে নিজের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করে নিবে, সে নিজেকে পরম ভাগ্যবান ব্যক্তি মনে করবে এবং দিনরাত নিজ পীরের খেদমতে মগ্ন থাকবে। তাঁর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্বরকম সম্মান করবে। প্রকাশ্য সম্মান হল, পীরের কথার জবাবে হটকারিতা বা পুনরুক্তি করবেনা। আর যদি ঘটনাক্রমে কখনও তার থেকে কোন শরয়ী মামলায় ভুলত্রুটি চোখেপড়ে তখনও তার সাথে কোনরূপ তর্ক করবে না। এর প্রথম কারণ হল, মনে করতে হবে যে সে মানুষ, ফেরেশতা নয়। এবং একথা সর্বজন বিদিত যে, মানুষ ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ নয়।

২য় কারণ হল, হতে পারে যে, পীরের নিকট ঐ মাসয়ালার কোন সুক্ষ্ম তাবীল রয়েছে, যা মুরীদের বোধগম্য নয়। অথবা পীরের কোন শরয়ী ওজর রয়েছে যা মুরীদের কাছে অনাবিষ্কৃত।

মোরশেদের প্রতি মুরীদের আর এক আদব হল যে, মোরশেদের জায়নামাযের সম্মুখে নিজের জায়নামায বিছাবে না। কোন কারণ বশতঃ মুরীদকে যদি নামাযের ইমামতী করতে হয় এবং মোরশেদ যে নামাযে মাক্তাদী হয় তাহলে জামাত শেষ হওয়া মাত্র মুরীদ ইমামের স্থান হতে পিছনে সরে আসবে। দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে পীরের সম্মুখে মুরীদ অধিক নফল নামায পড়বে না। যথাসাধ্য পীরের যে কোন হুকুম পালন করবে। পীরকে কখনও সিজদাহ্ করবে না। কারণ যে কোন অবস্থায় এ কুফরী কার্য। আর তার খেলাফে শরয়ী কোন নির্দেশ পালন করবে না। যে পীর শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ করে বা তা জায়েয মনে করে, সে পীর নয় বরং মহা পাপিষ্ঠ।

পীরের প্রতি অপ্রকাশ্য সম্মান হল, উল্লিখিত সমগ্র প্রকাশ্য আদবগুলি মুরীদ অন্তর দ্বারাও সমর্থন করবে। কোনরূপ বিরোধিতা বা দ্বিমত করবে না। কারণ তা হল নেফাকী পর্যায়ের কাজ।

ছালেকের জন্য জরুরী কালাম

ছালেকের জন্য প্রয়োজন যে সে সর্বদা নিজের আত্মার বিচার করবে। কিন্তু এ কাজ তার জন্য তখন সম্ভব হবে যখন সে কুসংসর্গ থেকে সম্পূর্ণরূপে পরহেজ করবে। কেননা মানুষ ও জিন শয়তানের তখন আর তার প্রতি কোনরূপ প্রভাব থাকবে না। বরং তার আত্মা শয়তানী আছর থেকে পুরোপুরি পাক ও পবিত্র হয়ে যাবে।

মুরীদের অন্যতম কর্তব্য হল দবরেশীকে মালদারী বা ধনাঢ্যতার উপরে স্থান দান করতে হবে। কারণ হল, এ পথে অন্তরকে পার্থিব আকর্ষণ এবং তার প্রভাব থেকে বিমুক্ত করাই হল আসল এবং মূলবস্তু। পার্থিব ভোগ বিলাসে লিপ্ত থেকে দুনিয়াবী মোহব্বত থেকে আলগ থাকা খুবই কঠিন এবং জটিল কার্য। ইহা সাধারণতঃ হয় উঠে না। সুতরাং উত্তম ব্যবস্থা হল যতদূর সম্ভব পার্থিব জাঁকজমক থেকে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছেদ করে দিবে। তাহলে অন্তরকে

দুনিয়াবী মোহব্বত থেকে পুরোপুরি আলগ রাখতে সক্ষম হবে।

হে প্রিয় বৎস! উল্লিখিত বিষয়গুলি হল ঐ সব বস্তু যাহা আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য অতিশয় জরুরী ও অত্যাবশ্যক। তুমি প্রশ্ন করেছ যে তাছায়্যেফ কি জিনিস? নিম্নে তার জবাব উল্লেখ করা হল।

তাছাওয়্যোফ কাকে বলে

তাছাওয়্যোফ দুটি বস্তুর নাম। প্রথমঃ আল্লাহতায়ালার সাথে সম্পূর্ণ সঠিক সম্পর্ক রাখা। দ্বিতীয়ঃ সৃষ্টিকুলের সহিত উত্তম ব্যবহার ও ধৈর্য্য-সহ্য প্রদর্শন করা। যে ব্যক্তির মধ্যে এ দুটি বিষয় পাওয়া যাবে সে খাঁটি সুফী। আল্লাহতায়ালার সাথে সঠিক সম্পর্ক রাখার তাৎপর্য হল, নিজের যাবতীয় কামনা-আকাঙ্খা এবং স্বাদ ও আকাঙ্খাকে আল্লাহর হুকুমের উপরে উৎসর্গ করা এবং সৃষ্টির সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করার তাৎপর্য হল অন্যের আকাঙ্খা ও জরুরতকে নিজের আকাঙ্খা ও জরুরতের উপরে প্রাধান্য দেয়া। শর্ত হল, তা খেলাফে শরীয়ত যেন না হয়। এজন্য যে, যে ব্যক্তি শরীয়তের কাজ করে অথচ শরীয়ত বিরোধী কাজে সাহায্য করে কিংবা তদ্রূপ কাজে আনন্দ প্রকাশ করে, সে মোটেই সুফী হতে পারে না। যদি সে তাছাওয়্যোফের দাবী করে তবে সে ভয়ানক মিথ্যুক। তুমি প্রশ্ন করেছ বন্দেগী কাকে বলে? তার জবাব নিম্নে উল্লেখ করা হল।

বন্দেগী কাকে বলে

বন্দেগী তিনটি বস্তুর নাম। প্রথমঃ আহকামে শরীয়তের সর্ব রকম ও সর্বাবস্থায় পুরোপুরি খেয়াল রাখা এমন কি যেন কোন রকম নড়াচড়া করা বা বসে থাকাও যেন শরীয়ত বিরোধী ধারায় না হতে পারে। দ্বিতীয়ঃ আল্লাহর মর্জীর উপর সর্বরকম ও সর্বাবস্থায় রাজী থাকা। তৃতীয়ঃ নিজের সমস্ত শক্তি ও

বাসনা পরিত্যাগ করে আল্লাহর শক্তি ও মর্জীর উপর খুশী প্রকাশ করা।

তুমি প্রশ্ন করেছ যে, তাওয়াক্কুল কাকে বরে তার জবাব নিম্নে উল্লেখ করা হল।

তাওয়াক্কুল কাকে বলে

তাওয়াক্কুল হল আল্লাহতায়ালার ন্যায় নিষ্ঠতার উপর পুরোপুরি নির্ভরতা এবং একীন পয়দা হওয়া এমনভাবে যে, এ বিষয়ের উপরে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সন্দেহের অবকাশ না থাকে। যে বস্তু যার অদৃষ্টে রয়েছে তা তার কাছে চলে আসবেই সমগ্র জগত তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও তা ঠেকাতে সক্ষম হবে না। আর যে বস্তু যার অদৃষ্টে নেই, তা সে কোন প্রকারেই লাভ করবে না, সারা জগত তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সাহায্য করলেও কোন লাভ হবে না। (এর অর্থ এ নয় যে, যে বস্তু লাভ হবে তা বসে বসেই পাওয়া যাবে, আর যে বস্তু লাভ হবে না তার জন্য চেষ্টা করা একেবারেই নিরর্থক। এটা আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত বিধানের বিপরীত।) বরং কথাটির তাৎপর্য হল যে কোন বস্তু লাভের জন্য আমল তথা চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। যে বস্তু লাভ করার মত, আল্লাহর তরফ থেকে তদনুরূপ ধারায় কাজ ও পরিশ্রম করার তাওফীক দান করা হয়। যারফলে প্রতিক্ষেত্রে সাফল্য এসে তার পদচুম্বন করে এবং শেষপর্যন্ত উদ্দেশ্যে কামিয়াব হয়ে যায়। নির্বোধ ও বিধর্মীগণ এ সাফল্য বা কামিয়াবীকে নিজের চেষ্টা, পরিশ্রম এবং জ্ঞান বুদ্ধির ফল বলে মন্তব্য করে এবং দ্বীনদারগণ তাকে আল্লাহর তাওফীক ও দান বলে ভাবে এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। ঠিক এভাবেই যে বস্তু লাভ হবার মত নয় তা লাভের চেষ্টা সাধ্যও পরিশ্রমের কোন না কোন স্থানে এমন কোন দুর্ঘটনা সৃষ্টি হয় যার দ্বারা প্রায় সুসম্পন্ন কাজটি হঠাৎ বিনষ্ট হয়ে যায়।

মোটকথা প্রতিটি উদ্দেশ্য ছোট হোক, বড় হোক তা সফল হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞানী ও দ্বীনদার একে আল্লাহর কুদরত, এবং আল্লাহর দেয়া নছীব

বলে মনে করে। আর বেদ্বীন ও নির্বোধ একে নিজস্ব জ্ঞান, পরিশ্রমের ফল বলে ভাবে।

হে হাতেম! তুমি প্রশ্ন করেছ যে এখলাছ কি জিনিস?

এখলাছ কাকে বলে

এখলাছ হল, তোমার সমস্ত কার্য একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্য হওয়া এবং তোমার কোন কাজেই সৃষ্টির সন্তুষ্টি ও রাজী না রাজীর সাথে কোন রকম সম্পর্ক না থাকা। তুমি যে কোন কাজই কর না কেন তোমার অন্তরকে সৃষ্টির সাথে সামান্য মাত্রও সম্পর্কিত ও তার উপর নির্ভরশীল না করা। কোন উত্তম কাজ করে তোমার হৃদয়ে মানুষের প্রশংসা ও ধন্যবাদ লাভের সৃষ্টি না হওয়া এবং কোন অনুত্তম কাজ করে তোমার অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত লোকোভয় সৃষ্টি না হওয়া।

হে হাতেম! স্মরণ রেখ, রিয়া সৃষ্ট বস্তুর ও তার প্রভাব প্রতিপত্তি হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিলেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর দাওয়াই হল তুমি সমস্ত সৃষ্টি জগতকে আল্লাহর শক্তির কাছে নিঃসার জড় বস্তুর মত মনে কর। তুমি অন্তরে বুঝে লও যে যেভাবে ইষ্টক ও প্রস্তর খন্ড নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাউকে কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনা। যখন পর্যন্ত না তাকে তুলে কেউ কারো প্রতি নিক্ষেপ করে। ঠিক এভাবেই মানুষ নিজ ইচ্ছা ও শক্তির দ্বারা কারো কোনরূপ উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রকৃত সামর্থ্যবান ও ক্ষমতাশালী আল্লাহ্‌র তেমনটি করার ইচ্ছা হয়।

স্মরণ রেখ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সৃষ্টিকে ক্ষমতাবান এবং ইচ্ছা পূরণকারী মনে করবে ততক্ষণ পর্যন্ত রিয়া থেকে মুক্তি এবং রেহাই পেতে পারবে না।

হে প্রিয় বৎস! তোমার অন্যান্য প্রশ্নগুলির জবাব আমার রচনা সমূহের মধ্যে সঠিক ও বিস্তারিত রূপে পাওয়া যাবে। তার কোন কোন প্রশ্ন এরূপ যে, তা

উদ্‌ঘাটন করা সিদ্ধ ও মোনাছেব নয়। এ পর্যন্ত যা কিছু তুমি জেনে নিলে সেগুলোর উপর আমল কর। তা হলে আল্লাহর মর্জী শীঘ্রই সে অবস্থাও তোমার নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে যা এখন পর্যন্ত তোমার অজানা রয়েছে।

হে প্রিয় বৎস! এর পরও যদি তোমার নিকট কিছু কঠিন মনে হয় তা হলে তুমি ধৈর্যাবলম্বন কর। আর অন্তরের মুখ ছাড়া অন্য কোন ভাবে আমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা কর না। দেখ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, "অ- লাও আন্নাহুম ছাবারু হাত্তা তাখরুজা- ইলাইহিম ফাকা-না খাইরাল্লাহুম।" অর্থাৎ হে নবী (ছঃ) যদি সে লোকগণ (বনুতামীম তোমার আগমণ পর্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করত, তবে তাদের জন্য ভাল হত। এভাবে হযরত খেজের (আঃ) এর উপদেশের প্রতি মনোনিবেশ করা যথাঃ "ফালা তাসআলনী আন শাইয়িন হাত্তা উহদেছা লাকা মেনহু যেকরান।" অর্থাৎ হযরত মুসা (আঃ) কে সম্বোধন করতঃ বল্লেন, আমার সাথে অবস্থান করার শর্ত হল, যদি আমার কোন কার্য্য নিজের ইচ্ছা ও মনোভাবের বিরোধী দেখেন তবে আপনি আমার নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বিষয় আমি নিজ থেকেই কিছু বলি। (মোট কথা আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন এবং কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। সঠিক সময় মত আমি নিজ থেকেই তোমার কাজগুলির নিগূঢ় রহস্য জানিয়ে দেব।

একইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অত্র এরশাদের প্রতি লক্ষ্য কর। "ছাউরীকুম্ আয়াতী ফালা তাছতা'জিলূন।" অর্থাৎ আমি শীঘ্রই তোমাকে আমার নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করাব, সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করনা। যার কথা হল, তোমার ধর্য্যালম্বন করতে হবে। দ্রুততর ও অধৈর্য্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে হবে।

যখন তুমি এই পর্যায়ে উপনীত হবে তো ইনশাআল্লাহু সব কিছু তোমার কাছে আপনা থেকে প্রকাশিত হয়ে যাবে।

সাধনা দ্বারা বিস্ময়কর নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ করা যায়

হে প্রিয় বৎস! যদি তুমি আল্লাহকে পাওয়ার পথে অবতীর্ণ হয়ে থাক তবে নানা ধরণের আশ্চার্যজনক বিষয়াবলি প্রত্যক্ষ করবে! অতএব তোমাদের এ পথের প্রত্যেকটি মনজেল অতিক্রম করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা প্রয়োজন।

স্মরণ রেখ পরিশ্রম এবং প্রাণপন চেষ্টা ব্যতীত কোন গুরুতর কাজ সাধন করা সম্ভব নয়। হযরত যুন্নুন মিছরী (রহঃ) তাঁর এক শিষ্যকে কত উত্তম একটি শিক্ষামূলক উপদেশবানী শুনিয়েছিলেন-যথাঃ-"ইন কাদারতা আলা বাজলির রূহে, ফাতায়ালি ওয়া ইল্লা ফালা তাশগাল্ বেনায হাতহু ছুফিয়াতে ওয়ালকাল" অর্থাৎ তুমি যদি এ পথে মারেফাতের রাস্তায়) মৃত্যুপণ চেষ্টার সামর্থ্য রাখ তা হলে আল্লাহর নাম নিয়ে নেমে পড়। সুফীদের মিষ্টি কথা ও কেচ্ছা কাহিনীতে মগ্ন হওয়ার চেষ্টা কর না।

আটটি উপদেশ

প্রিয় বৎস! এবার আমি তোমাকে সংক্ষিপ্তভাবে আটটি উপদেশ দান করে তোমার থেকে বিদায় নেব। এর মধ্যে চারটি হল বর্জনীয় আর চারটি হল এ প্রকার যার উপর আমল করা অতিশয় প্রয়োজন। এ গুলোকে গাঁট বেধে লও সদা সর্বদা আমল কর। তানা হলে কাল কেয়ামতে তোমাদের এলেমই তোমাদের বিরোধিতার দলীল স্বরূপ দাঁড়িয়ে যাবে।

বর্জণীয় বিষয়গুলির প্রথমটি হল তোমার পক্ষে যতদূর সম্ভব কোন প্রকারেই কারও সাথে বাহাছ মোবাহাছা বা তর্ক বিতর্ক করো না। এতে ফায়েদা মোটেই নেই কিন্তু তার পরিবর্তে বিপদ এবং গুণাহ্‌র অন্ত নেই।

স্মরণ রেখ বাহাছ মোবাহাছা রিয়াকারী, দুশমনী, চোগলী, অহমিকা, শত্রুতা, দাম্ভিকতা প্রভৃতি অসৎ স্বভাবগুলির ভিত্তি এবং উৎস স্বরূপ।

অবশ্য যদি ঘটনাক্রমে কোন মাসয়ালা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়, তখন খাঁটি নিয়তে সত্যউদ ঘাটনের উদ্দেশ্য বাহাছ করা কোন ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু স্বরণ রেখ, খাঁটি নিয়্যতের দুটি নিদর্শন রয়েছে।

সত্যের আকাঙ্খী হওয়া

তোমাকে সর্বাবস্থায় সত্যোদ্‌ঘাটনের আকাঙ্খী হতে হবে। চাই তা' তোমার প্রতিপক্ষের কাছ থেকে প্রকাশ হোক বা তোমার নিজের থেকে হোক। যদি অবস্থা এই হয় যে, তুমি হৃদয়ের সত্যিকার অনুভূতি দ্বারা এ কথা বুঝতে পার যে, আমি যা বলছি তাই সত্যি। এবং প্রতিপক্ষ অযথা তর্ক করছে ও নিজের কথায় জেদ ধরে আছে, তখন তোমার উচিত হবে সেই মুহূর্তে তর্ক পরিত্যাগ করে চলে আসা। নতুবা পরিণতি এমন হতে পারে যে তোমাদের দু'পক্ষের মধ্যে ভীষণ মনোমালিন্য ও অশান্তিজনক ঘটনা দেখা দিবে যা এক মারাত্মক গুণাহর কারণ স্বরূপ।

তর্ক বিতর্ক না করা

তর্ক বিতর্ক যতদূর সম্ভব অপ্রকাশ্য স্থানে বসে হতে হবে। সাধারণ লোকদের সামনে কশ্মিনকালেও মোবাহাছার অনুষ্ঠান করবেনা। এর ফলে তুমি মোনাজারার নানারূপ বিপদ ও ঝামেলা থেকে নিরাপদ থাকবে।

কোন কঠিন বিষয় সম্পর্কে আলেমদের কাছে সমাধান জিজ্ঞাসা করা, ঠিক তদ্রূপ যেমন কোন রোগী ব্যক্তির চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসার কথা জিজ্ঞাসা করা, আর তার উত্তর প্রদান করা এরূপ যেমন চিকিৎসকের রোগী ব্যক্তিকে চিকিৎসা বা ঔযধের কথা বাতলে দেয়া।

এলেমহীন মূর্খগণ যেন সব রোগীদের ন্যায়। আর আলেমগণ তাদের ঠিক চিকিৎসক সদৃশ। যেভাবে একজন আধা হাকীম ব্যক্তি জনৈক বিজ্ঞ চিকিৎসক

হতে পারে না, ঠিক সেইভাবেই জনৈক আধা আলেম একজন সুনিপুন–আলেম বা বিজ্ঞ–বিচক্ষণ লোক হতে পারে না।

জেনে রেখ বিজ্ঞ চিকিৎসক এমন রোগীর চিকিৎসা শুরু করে যার বাঁচাবার ক্ষীন আশাও পোষণ করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে যেখানে রোগের অবস্থা ভয়ানক ও রোগীর দেহ এবং তবিয়তের অবস্থা এমন যে, চিকিৎসক তার পূর্ণ অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝে নিতে পারে যে, রোগীর জন্য কোন চিকিৎসাই কার্যকরী নয় তখন সে উক্ত রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সেখান থেকে চলে যায়। কেননা বিজ্ঞ চিকিৎসক এ ধরণের রোগীর পেছনে মূল্যবান সময় নষ্ট করাকে বোকামীরই নামান্তর বলে মনে করে।

মূর্খতা চার প্রকার

মূর্খতা রূপ রোগটির চারটি অবস্থা। তার মধ্যে তিনটি একেবারে চিকিৎসার অযোগ্য এবং ভয়ানক শ্রেণীর আর একটি এরূপ যে, তা চিকিৎসার যোগ্য এবং চিকিৎসায় তা ভাল হতে পারে।

চিকিৎসার অযোগ্য রোগগুলির মধ্যে প্রথমটি হল হিংসা। যে ব্যক্তি হিংসাবশতঃ তোমাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করে, তুমি তাকে যত উত্তম ও পরিস্কার জবাবই দিবে, তোমার প্রতি তার ক্রোধ ও হিংসা ততই বৃদ্ধি পাবে। বৎস। তুমি কি হিংসা রোগের কথা জান যে তা কত বেশী বেশী ভয়ানক ও চিকিৎসার কত বেশী অযোগ্য। কোন এক ব্যক্তি খুবই উত্তম ও সত্য কথা বলেছেন যে, "কুল্লুল আদাওয়াতে কাদ তুরজা এযালাতুহা ইল্লা আদাওয়াতা মান আ–দাকা মিন হাছাদিন।"

অর্থাৎঃ সর্ব রকম শত্রুতারই বিলুপ্তি আশা করা যায়, যায়না শুধু এক ব্যক্তিরই শত্রুতা নষ্টের আশা করা, যে তোমার সাথে শত্রুতা করে শুধু হিংসার কারণে।

এমন ব্যক্তির চিকিৎসা হল যে, তুমি তার অবস্থার উপরই ফেলে রাখবে। তার পিছে সময় নষ্ট কর না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনে পাকে এরশাদ করেছেন "আম্মান তাওয়াল্লা আন ঝিকরে অ–লাম ইউরিদ ইল্লা হায়াতাদ্দুনইয়া।" অর্থাৎ (হে নবী (দঃ) তুমিও তার প্রতি বেশী লক্ষ্য করনা যে, আমার স্মরণ থেকে পিছে ফিরে গিয়েছে। আর এর উদ্দেশ্য পার্থিব জীবন ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

স্মরণ রেখ কোন হিংসুক, যা কিছু করুক না কেন সবই তার হিংসার মধ্য দিয়ে হয়। এজন্য তার প্রতি মুহূর্তে হৃদয় মধ্যে হিংসার অনলে জলে মরতে হয়।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত রয়েছে, "আল হাছাদু ইয়াকুলুল হাসনাতে কামা তা'কুলুন্নারুল হাতাবা।" অর্থাৎ হিংসা পুণ্যসমূহকে এ ভাবে ধ্বংস করে যে ভাবে অগ্নি কাঠ সমূহকে ধ্বংস করে থাকে।

চিকিৎসার অযোগ্য দ্বিতীয় রোগটি হল বোকামী বা নির্বুদ্ধিতা। নির্বোধ সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ) এর উক্তিটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহর নির্দেশে আমি মৃতকে পর্যন্ত জীবিত রাখতে পারি কিন্তু কোন আহমক বা নির্বোধকে জ্ঞান দান করায় আমি সক্ষম হইনি। আহমকী রোগে প্রায়শঃ তারাই আক্রান্ত হয় যারা কিছুদিন এলেম শিক্ষা কার্যে কাটিয়ে, দু'চারখানা কিতাব পাঠ করে, অতঃপর নিজেকে নিজে যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম বলে মনে করে। আর যে সকল বড় বড় ওলামাদের কথা থেকে (যাদের সারা জীবন এলেমের চর্চায় ও সেবায় অতিবাহিত হয়েছে) নানা ধরণের প্রশ্ন শুরু করে দেয় ও তাদের বিভিন্ন মতবাদের বিরুদ্ধে নিজ মত প্রকাশ করে। অজ্ঞানতার কারণে সে এ কথাটুকুও বুঝতে পারে না যে, আমি যে ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে লেগে গিয়েছি তাদের এ ক্ষেত্রে কত দীর্ঘ দিনের চর্চা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তাদের দ্বীনি খেদমত কত ব্যাপক প্রশস্ত। হে বৎস! তুমি এ ধরণের নির্বোধ লোকদের থেকে সর্বদা দূরে থেক। এবং এদের কথা বার্তাও মতামতের উত্তর প্রদান করা থেকে বিরত থাক।

তৃতীয় রোগ হল গাবাওয়াত বা যেহেনের অপরিপক্কতা। এটাও একটা চিকিৎসার অযোগ্য ব্যাধি। এ রোগে আক্রান্ত রোগীগণ বোযর্গ লোকদের উক্তির সারমর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবণ করতে অক্ষম থাকে। এমন কি নিজের স্থূলবুদ্ধি এবং স্বল্প বুঝের কারণে যে অধম এতটুকুও বুঝেনা যে তাঁহাদের কথার অর্থ না বুঝা শুধু আমাদের জ্ঞান ও বুঝের ত্রুটির কারণে ঘটে থাকে। এ ধরণের অপরিপক্কতা বুদ্ধি লোকদের কথার জবাব প্রদান থেকেও তোমরা সাধ্যমত বিরত থাক। যদি কখনও বিশেষ কারণে জবাব প্রদান করতে হয়, তাহলে তার জ্ঞানও বুঝের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে জবাব প্রদান করবে। যেন এরূপ না হয় যে সে তোমার কথার ভুল অর্থ বুঝে বসে। তাকে কোন কঠিন সমস্যা বুঝাবার জন্য তাকে মোটেই চেষ্টা করবে না। কেননা হাকীকতের জ্ঞান ও অনুভূতি তার জ্ঞান ও উপলব্ধি থেকে বহু উর্দ্ধের বস্তু।

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন, "নাহনু মাআশেরুল আমবিয়ায়ে উমেরনা আননুকাল্লিমা ন্নাছা বেকাদরে উভুলিহিম, অর্থাৎ আমাদের নবী সম্প্রদায়কে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন মানুষের সাথে তাদের জ্ঞানের অনুরূপ কথা বলি। মূর্খতা রোগের চতুর্থ প্রকারটি হল এমন রোগ, যা চিকিৎসার যোগ্য। এ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এমন জাহেল বা মূর্খ যে তার মূর্খতা সত্ত্বেও সে যারপরনেই তীক্ষ্ণ মেধাবি এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি। খাঁটি মনে সে সত্যের পিয়াসী। ক্রোধ, কাম, হিংসা এবং ধন ও সম্মানের কামনা থেকে তার অন্তর পবিত্র, এরূপ সত্যান্বেষী ব্যক্তি যদি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে তার উত্তর দিবে এবং ব্যাপারটিকে সম্যক রূপে বুঝিয়ে দিয়ে তাকে সুস্থ ও শান্ত করে দিবে, এটা তোমার জন্য ওয়াজিব ও একান্ত আবশ্যক।

ওয়াজ বক্তৃতা তরক করা

বর্জনীয় কাজগুলির মধ্যে ওয়াজ বক্তৃতাও অন্যতম, এ কাজটি থেকে তুমি যথাসাধ্য পরহেজ করবে। অর্থাৎ নিজে স্বয়ং যত দিন পর্যন্ত সে কাজটির আলেম না হবে তত দিন সে কাজটি সম্পর্কিত কোন ওয়াজ নসিহত অন্যকে করা

থেকে বিরত থাকবে। স্বরণ রেখ আল্লাহ তায়ালার অত্র নির্দেশ কে সদা-সর্বাদা ভয় করে চল, যে নির্দেশ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর আরোপিত হয়েছিল। যথাঃ "ইয়া ইবনা মারিয়ামা এজ নাফসেকা ফাইনিত্তায়েজতা ফা এয়িন্নাছা ওয়া ইল্লা ফাসতাছয়ী মিন্নী'' অর্থাৎ হে এবনে মারইয়াম (ঈসা)। প্রথমতঃ তুমি নিজে নিজেকে নসিহত কর যখন তুমি নিজে নসিহত অনুযায়ী আমল কর তখন অন্য লোককে উপদেশ দান কর, যদি তুমি নসিহত আমল করতে না পার তাহলে তুমি আমার কাছে লজ্জিত থাক, এবং নিজে বে আমল থেকে অন্যকে উপদেশ দানের ধৃষ্টতা প্রদর্শন কর না।

যদি প্রয়োজন বোধে তোমাকে অন্যকে নসিহত করিতেই হয় তাহলে দুষ্ট বস্তু থেকে অবশ্যই বিরত থাক। এক হল বাড়াবড়ি ও অতিরঞ্জন মোটেই করবেনা, অর্থাৎ গুছিয়ে গুছিয়ে সুন্দর ইবারাত ব্যবহার মনোমুগ্ধকর বিষয় বস্তু এবং ছন্দোবদ্ধ কবিতা পাঠ করে ওয়াজ বক্তৃতাকে আকর্ষণীয় ও শ্রুতি মধুর করে তোলার চেষ্টা কর না। আল্লাহ তায়ালা এভাবে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করাকে পছন্দ করেন না।

স্মরণ রেখ, ক্রমে ক্রমে এভাবে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করা যখন সীমাতিক্রম করে ও এ অভ্যাস দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, তখন বাতেনী ব্যাধি এবং অন্তরে উদাসীনতার সৃষ্টি হয়ে যায়। (আল্লাহ তা থেকে রক্ষা করুন)

হে প্রিয় বৎস। ওয়াজ নসিহত তো তাকেই বলে, যার দ্বারা পারলৌকিক বিপদ সমূহ, আর যে সব বিষয় বস্তুগুলো ইবাদত বন্দেগীতে বাধার সৃষ্টি করে, সেগুলো সম্পর্কে জানা শুনা যায়। এসব বিষয়গুলি অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করা চাই। মালেকুল মওতের উল্লেখ মুনকের নকীর ফেরেশতার প্রশ্ন সমূহ, কবরের আযাব কিয়ামতের ভয়াবহ হৃদয় বিদারক অবস্থা, নেকী বদীর হিসাব নিকাশ, আমলের পরিমাণ ও ওজন করণ, পুলছিরাত ও তার উপর দিয়ে পার হওয়ার অবস্থা, দোজখের আগুন ও তার ভীষণতর অবস্থা এবং তৎকর্তৃক পাপীদিগের অসহনীয় আযাবের বর্ণনা প্রভৃতি দ্বারা নিজেকে ও অন্যকে ভীতি প্রদর্শন করা যেতে পারে। মানুষকে তার দোষ ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করে

তার ব্যর্থ বিপর্যস্ত বিগত জীবনের প্রায়শ্চিত্ব ও ক্ষতি পূরণের প্রেরণা দেয়া যেতে পারে। মূলতঃ এগুলিই হল ওয়াজ ও নসিহত। জবানের চাটুকারিতা এবং কিচ্ছা ও কাহিনী বর্ণনা ওয়াজ নসিহত নয়।

একটু চিন্তা করে দেখ, যদি কারও গৃহের দিকে প্রবল তূফান ছুটে আসতে থাকে এবং গৃহকর্তার এ ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ না থাকে যে কোন মুহূর্তে গৃহে অবস্থান হেতু তার পিতা-মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা তূফানের কবলিত হযে প্রাণ হারাতে পারে, তবে এমতাবস্থায় কিগৃহকর্তা স্বগৃহবাসীগনকে হুঁশিয়ারী স্বরূপ চিন্তা ভাবনা করে ভাল ভাল শব্দ চয়ন করে বালাগাত ও ফাসাহত সমৃদ্ধ বাক্য তৈরী করে তার দ্বারা তাদেরকে দূর্যোগ ও বিপদের কথা জানাবে, না তাড়াতাড়ি মুখথেকে যে ধরণের কথা বা বাক্য আপন থেকে বেরিয়ে আসে তাদ্বারা আশু বিপন্নদেরকে সাবধান করতে হবে।

প্রিয় বৎস। ওয়াজ নছিহতের ক্ষেত্রেও ঠিক এই একই অবস্থা। অর্থাৎ এর দ্বারা নিজে উপকৃত হবে এবং অন্যকেও উপকার করবে সুতরাং এখানে সরল শব্দ-বাক্য ও ইবারত প্রয়োগ প্রয়োজন। এখানে বানাওটি ও বাড়াবাড়ির কোন স্থান নেই।

ওয়াজ নসিহতের ক্ষেত্রে আর এক বস্তু থেকে পরহেজ করা প্রয়োজন বস্তুটি হল ভীষণ মারাত্মক। ওয়াজ বা নসিহত প্রদান কালে এরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হওয়া যে, এমন ঢংয়ে ওয়াজ করবে যাতে লোকগণ কেঁদে কেঁদে বক্ষ ভিজিয়ে দেয়, চিৎকার দিয়ে উঠে। আত্মবিস্মৃত হয়ে বসন ভূষণ চিরা ফাড়া শুরু করে তাকবীর ধ্বনি করে উঠে।

ওয়াজ বক্তৃতা দ্বারা এ সব অবস্থার সৃষ্টি করতে পারলে মানুষ আমার ওয়াজের অত্যন্ত প্রসংসা করবে যে, মাশা আল্লাহ অমুক মৌলুবী সাহেব কৃত উত্তম ওয়াজ করেন। তার ওয়াজে জলসার সমস্ত লোক প্রভাম্বিত হয়। মানুষের দেলে তার বক্তৃতা দারুন ভাবে রেখাপাত করে প্রভৃতি প্রশংসা সূচক উক্তি সমূহ শ্রোতাবৃন্দ প্রকাশ করতে থাকবে।

বৎস! স্মরণ রেখ, এ গুলি হল নিছক খোশামোদের লালসা, যা গাফলত বা অজ্ঞনতা অবহেলার দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে। গাফলাত এমনই এক অভিশাপ, যা বান্দাকে আল্লাহর নিকট থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করে।

বক্তা বা নসিহত কারীর বক্তৃতা বা নসিহত প্রদান কালে এই ধরণের চেষ্টা থাকা চাই যে কিভাবে শ্রোতামণ্ডলীকে ইহকাল থেকে পরকালের দিকে, নাফরমানী থেকে নির্দেশ পালনের দিকে, অহংকার অহমিকা থেকে বিণয় ও ধর্ম ভীরুতার দিকে তারগীব বা উৎসাহপ্রেরনা দান করা যায়। আর আনুগত্য ও ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধিকরা যায়।

বিশেষ মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করে দেখ, ওয়াজ শ্রোতাদের মধ্যে আল্লাহর সন্তোষ বিরোধী ও শরীয়তের বিপরীত এবং এ সমস্ত লোক কোন কোন অসৎ কর্ম সমূহে লিপ্ত, এ সমস্ত বিষয়ের উপরে উত্তম রূপে লক্ষ্য করে তাদের সম্মুখে এ সব উপদেশ পেশ কর, যাতে তাদের নিজেদের ভেতরেই এই সকল দোষ সংশোধনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

যার অন্তরে ভয়ের আধিক্য তাকে আশা ও সান্ত্বনার বাণী শ্রবণ করাও। যার মনে আশার প্রাবল্য বিদ্যমান তাকে ভয় ভীত ও পরহেজগারীর কথা বল।

মোট কথা ভাল ভাবে চিন্তা ভাবনা করে তাদের দোষ ক্রটি গুলির ক্ষতি এবং তাদের পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত কর। এ ভাবে যে যখন তারা উপদেশের বৈঠক থেকে বিদায় হয় উত্তম গুণ এবং ভাল আকাঙ্খা সমূহ অন্তরে নিয়ে বিদায় হয় এবং তাদের হৃদয় মধ্যে আনুগত্য ও ইবাদাতের উদ্দীপনা বর্তমান থাকে আর গুনাহ ও নাফারমানীর জন্য ভয় ও ঘৃনার উদ্রেক হয়।

যে ওয়াজ মাহফিল এরূপ নয় তা বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। যে বক্তা উল্লেখিত বিষয় গুলোর প্রতি লক্ষ্য না রাখে, সে আসলে এমন শয়তান যে আল্লাহর বান্দাকে পথ ভ্রষ্ট করে। এবং তাকে অন্যায় ভাবে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এর ফাসাদ তথা দুর্যোগ সমূহ শয়তান অপেক্ষা বেশী মারাত্মক। মানুষের উচিত যেন এমনি বক্তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। আর

যদি কোন সাহসী ও শক্তিশালী লোক হয় তবে তার উচিত সে যেন এ রূপ বক্তাকে বক্তৃতা মঞ্চ থেকে ঘাড় ধরে নামিয়ে দে'য় তা হলে আল্লাহর বান্দাগণ তার অপকার থেকে নিরাপদ থাকবে। এটাও আমর বিলমা'রূপ এবং নেহী আনিল মুনকার অর্থাৎ উত্তম কাজের নির্দেশ দান ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত করণের একটি প্রকার বটে।

রাজা বাদশাহ ও আমীর ওমারাদের নিকট না যাওয়া

বর্জনীয় কার্যগুলির অন্যতম হল অত্যাচারী, অত্যাচারী ধর্ম বিরোধী রাজা বাদশাহ ও আমীর ওমারাদের সাথে সম্পর্ক না রাখা তাদের দরবারে না যাওয়া ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করা। কেননা এরূপ কর্মে নানা ধরণের বিপদে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তবে যদি কোন বিশেষ কারণে বা ঘটনাক্রমে তাদের নিকট যেতেই হয় অথবা নিজ থেকে তারা যদি তোমাদের কাছে আগমন করে তাহলে তাদের তোষামোদ প্রশংসা প্রভৃতি থেকে বিরত থাক।

হাদীস শরীফে আছে যখন কোন ফাসেক বা জালেমের প্রশংসা করা হয়, তখন আল্লাহর গজব অবতীর্ণ হয়। আর যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীকে দীর্ঘজীবি হওয়ার দোয়া করে, সে যেন এ কথা পছন্দ করে যে আল্লাহর গজব তার জমিনের উপর অবতীর্ণ হোক।

রাজা–বাদশাহ ও আমীর–ওমরাদের হাদীয়া উপঢৌকণ গ্রহণ করনা

বর্জনীয় বিষয়গুলির অন্যতম হল রাজা–বাদশাহ ও আমীর উমারাদের প্রেরিত নজর নিয়াজ বা হাদিয়া–উপঢৌকন। এগুলি কোন অবস্থাতেই গ্রহণ না

করা চাই, যদি তোমার বিশেষ ভাবে জানা থাকে যে, তাদের প্রেরিত মালে কোন রূপ দোষ ত্রুটি নেই, বরং একেবারে সিদ্ধ বা হালাল, তবু তা গ্রহণ করবে না। কারণ তা গ্রহণ করলে ধীরে ধীরে তাদের মাল-দৌলতের প্রতি তোমার লালসা বৃদ্ধি পাবে, আর এরূপ ঘটনা তোমার দীনের ভিতরে লোকছান সৃষ্টি হওয়ার উৎস স্বরূপ তা ছাড়া এ প্রচলনকে পশ্রয় দেয়া রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমারাদের ফেছক ও ফুজুরিকে শক্তি যোগান দেয়ার নামান্তর বটে। অন্ততঃ এ অবস্থা তো সৃষ্টি হবেই যে, তার ফলে তুমি তাদের দীর্ঘায়ু লাভের জন্য নিশ্চয় আশা করবে, আর এটা তাদের অন্যায় অবিচার ফেসকও ফুজুরী প্রভৃতি অপকাম গুলির প্রসার লাভের আকাঙ্খা করারই অনুরূপ বৈকি!

বৎস সাবধান থেক, এ ব্যাপারের মধ্য দিয়ে শয়তান যেন তোমার পথে পদক্ষেপ করতে না পারে ও তোমাকে এভাবে প্রতারণা করার সুযোগ না পায় যে, নিজের জন্য তা গ্রহণ না-ই করলে কিন্তু গরীব দুঃখীদের মাঝে তা বন্টন করে দিয়ে তাদের কিছুটা উপকার করা গেলে তাতে তো দোষের কিছুই নেই। কিন্তু জেনে রেখ, গরীব দুখীগণ এরূপ মাল দৌলত ফেসক ও ফুজুরীমূলক কাজেই খরচ করবে। কেননা এ ধরনের সাহায্য তারা যতটাই লাভ করুক না কেন, কোন কুকাজ ব্যতীত নেককাজে এগুলো খরচ করতে পারবে না।

স্মরণ রাখবে, একাজ শয়তানের এমন এক কৌশল, যে তার দ্বারা সে হাজার হাজার লোককে অতি সহজে নিজের জালে জড়িয়ে নেয় এবং এভাবে তাদেরকে অতি সহজেই ধ্বংস ও বিনষ্ট করে দেয়।

সাবধান থেক, কখনও ভুলেও যেন রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমারাদের সাহায্য সম্পর্কে এরূপ ধারণা না কর।

হে প্রিয় বৎস! এ হল সে চার বস্তু, যেগুলো থেকে প্রত্যেক সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য।

এখন আমি তোমাকে সে চারটি অবলম্বনীয় বিষয়ের পরিচয় দিচ্ছি যেগুলোর উপর আমল করা তোমাদের একান্ত জরুরী।

চারটি অবলম্বনীয় বস্তু

চারটি অবলম্বনীয় বিষয়ের প্রথমটি হল তোমার প্রতিপালকের সাথে এমন সম্পর্ক রাখা যেমন দুনিয়াতে একটি গোলাম তার মুনিবের সাথে রাখে। অর্থাৎ যে ভাবে একটি গোলামের জন্য কর্তব্য প্রতি মুহূর্ত সর্বরকম স্বীয় মুনীবের সন্তুষ্টি ও রেজামন্দী রক্ষা করার কাজে ব্যস্ত থাকা ঠিক সেভাবেই তোমার প্রতিটি কার্য্য-কলাপ নিজের প্রভুর খুশীর উদ্দেশ্যে হওয়া চাই, একটু চিন্তা কর, যদি তোমার গোলাম দ্বারা কোন কাজ তোমার ইচ্ছার বিপরীত ঘটে যায় তাহলে তা তোমার ক্রোধের কারণ হয় ও তুমি তাকে খুবই অন্যায় মনে কর। অথচ সে গোলাম তোমার চিরস্থায়ী অধিনস্ত এবং প্রকৃত বান্দা নয় বরং শুধু আর্থিক আনুকূল্যে সাময়িকভাবে সে তোমার অধীনস্থ। পক্ষান্তরে তুমি আল্লাহতায়ালার প্রকৃত বান্দা এবং তিনি তোমার সৃষ্টিকর্তা আর তুমি তার সৃষ্ট জীব। এখন বল তো, আল্লাহতায়ালার যেসব হুকুম রয়েছে গোলামের উপর মুনীবের হুকুমের সাথে তার কি তুলনা হতে পারে ?

হে বৎস! ন্যায় নিস্ব কাজ কর এবং হাকীকত (প্রকৃত অবস্থা) বুঝার চেষ্টা কর। স্মরণ রেখ, আল্লাহর আনুগত্য এবং নির্দেশ পালনে উল্লিখিত ইঙ্গিতের দিকে লক্ষ্য এবং খেয়াল রেখ।

মাখলুকের সাথে কিরূপ আচরণ করা চাই

দ্বিতীয় বিষয় হল, আল্লাহর সৃষ্টির সাথে এমন আচরণ প্রদর্শন কর, যেমন আচরণ তাদের থেকে তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর। হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন, "লা ইয়াকবেলু ঈমানুল আবেদ হাত্তা ইউহিবু লেগায়রিন্নাছে মা ইউহিবু লে নাফছিহী"-অর্থাৎ কারও ঈমান সে পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যে পর্যন্ত সে অন্যের জন্য যে জিনিস পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

কোন্ এলেম চর্চা করা চাই

তৃতীয় বিষয়টি হল, নিয়মিত ভাবে এলেমের চর্চা কর এবং সাধ্যমত তুমি তাতে লিপ্ত থাক। পশ্ন হল তা কোন্ এলেম? এভাবে তা নির্বাচন করা যেতে পারে। ধরে নাও যদি তুমি নিশ্চিত রূপে অবগত হতে পার যে তোমার আয়ুষ্কালের আর মাত্র যতটি দিন অবশিষ্ট রয়েছে এমনি অবস্থায় তোমার মনে কোন এলেম চর্চা করার ইচ্ছা জাগবে এর জবাব প্রদান করা মোটেই কঠিন নয়। এ সময় তোমার মনে এলমে ছরফ, এলমে নহু, এলমে মানতেক, ফালসাফা, এলমে হেকমত প্রভৃতি চর্চা করার প্রবৃত্তিই হবেনা, কারণ হল, তোমার জানা রয়েছে যে, এসব এলেম পরকালে আল্লাহ্র দরবারে কোন ফায়েদা পৌছাবে না। সুতরাং এ সময় আপনা থেকেই তুমি যে এলেম সন্ধান করবে, যা মৃত্যুর কালেও পরকালে তোমার জন্য উপকারে আসবে এবং যাদ্বারা তুমি আল্লাহর দরবারে মুক্তির প্রার্থনা করতে পারবে। এ এলেম আর কিছু নয়, এ এলেম হল তা যার দ্বারা তুমি নিজের মনের অবস্থা অবগত হতে পার নিজের দোষ-গুণের পরিচয় ও পরিমাপ করতে পার। যে এলেম দেলকে পার্থিব বস্তুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন থেকে পাক ও পবিত্র রাখার পথ বাতলিয়ে দেয় এবং আল্লাহর মহব্বত ও ইবাদত আগ্রহ সৃষ্টি করার রাস্তা প্রদর্শন করে।

হে প্রিয় বৎস! একটি দৃষ্টান্ত শ্রবন কর এবং তার অর্থের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান কর অতঃপর এর প্রতি আমল করার চেষ্টা কর। মনে কর যেন তুমি এ কথা জানতে পারলে যে মাত্র সাত দিন পরে তোমাকে বাদশাহের দরবারে সালাম জানাতে হাজিরা প্রদান করতে হবে তবে নিশ্চয়ই তুমি সারা সপ্তাহটিতে বাদশাহর দরবারে উপস্থিতির ব্যবস্থা ও আয়োজনেই ব্যপৃত থাকবে এবং তা সত্ত্বেও তোমার মনের এ দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান হবেনা যে কি জানি আমার এ ব্যবস্থাটি হয়ত বাদশাহর দরবারের উপযোগী হয়নি। হয়ত বা আমাকে সেখানে কত লজ্জাই পেতে হয়। এসব চিন্তা ভাবনায় তোমার অবস্থা হয়ে যাবে যে রাত্রে তোমার চোখে নিদ্রার লেশও দেখা যাবেনা। মনে এতটুকু স্বস্তি থাকবে না।

হে বৎস! দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র বাদশাহর দরবারে হাজিরা দিবার জন্য যখন এত রকমের আয়োজনের প্রয়োজন হয় সেখানে কয়েকদিনের এ পার্থিব জীবন শেষে সকল বাদশাহর দরবারে যে তোমার অবশ্য একদা হাজিরা দিতে হবে সে হাজিরা দিবার প্রয়োজনে তোমাকে যে কত বেশী রকমের আয়োজন ও প্রস্তুতির প্রয়োজন তা সহজেই উপলব্ধি করতে পার। এ হাজিরা কিন্তু তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য দুনিয়ার সবার জন্য একান্তই নিশ্চিত ও অবধারিত, কারও এ হাজিরা থেকে রেহাই মিলবেনা। অতএব হে বৎস! এ মহান শাহান শাহের দরবারে হাজিরার কালে যেন কোন কিছুর অভাব জনিত কারণে তোমাকে লজ্জা না পেতে হয়, সে দিকে এই মুহূর্ত থেকে লক্ষ্য করে চল।

আমল কবুল হওয়ার জন্য খুলুছিয়তের প্রয়োজন

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন "ইন্নাল্লাহা যা ইয়ানজুরু এলা ছুওয়ায়েকুম অলা এলা আ'মালেকুম অলা-কিন ইয়ানজুরু এলা নিয়্যাতে কুম। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের চেহারা দেখেন না, তোমাদের আমল (বা কাজকর্ম) ও দেখেন না বরং তিনি দেখেন শুধু তোমার অন্তরের নিয়তকে এ হাদীছ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আমলের জন্য খালেছ নিয়তের প্রয়োজন রয়েছে। যে আমলে খালেছ নিয়ত নেই তা আল্লাহর দরবারে একেবারেই নিরর্থক তাই তিনি সেদিকে ফিরেও তাকান না এবং সে আমল তিনি কবুল ও করেন না।

প্রিয় বৎস! জেনে রে এতটুকু পরিমাণ দ্বীনি এলেম যা দ্বারা আহকামে এলাহী পুরাপুরি ভাবে পালন করতে পারা যায় তা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজে আইন।

এতটুকু এলেম হাসিল করার পর অন্যান্য প্রয়োজনীয় এলেম শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া বটে।

সন্তান সন্ততির জন্য মাল সঞ্চয় কর

সন্তান সন্ততির ভরন পোষণ ও জীবন যাপন প্রভৃতির উদ্দেশ্য কিছু মাল সঞ্চয় করতে পার, খুব দীর্ঘ দিনের জন্য নয়, যদি সঞ্চয় কর তবে খুব বেশী

হলে, এক বছরের খাওয়া পরা ও অন্যান্য সব কিছু চলে এতটুক পরিমাণ জমা করতে পার।

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) ও উম্মাহাতুলমু'মিনীনদের জন্য জীবিকা জমা করতেন এবং সাথে সাথে তিনি এরূপ দোয়াও করতেন "আল্লাহু মাজআল্ রেয্কা আলে মুহাম্মোদিন কাফাফান'' অর্থাৎ হে খোদা। মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য প্রয়োজনানুরূপ রুজী দান কর।

আজওয়াজে মোতাহহরাতের মধ্যে বিবি আয়েশা (রাঃ) যেহেতু পুরাপুরি মাত্রায় আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল কারিনী অর্থাৎ পরিপূর্ণ রূপে নির্ভর কারীনি ছিলেন। অতএব রাসূলে করীম (ছঃ) তার জন্য এক বছর তো দূরের কথা এক দিনের মাল ও জমা করতেন না।

প্রিয় বৎস! যা কিছু তুমি জানতে চেয়েছ তা প্রায় সবই আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করেছি। তোমার উচিত এখন এগুলোর উপর আমল করা। আর তুমি নিজের দোয়ায় আমার কথাও স্মরণ রেখ এবং নিম্নোলিখিত দোয়াটি সদা সর্বদা বিশেষতঃ প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের বাদে পাঠ কর।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) শিখানো সর্বাদা পাঠের দোয়া

আল্লাহুম্মা আছয়ালুকা মিনান্নেসাতে তামামেহা ওয়া মিনাল এছমাতে দাওয়ামেহা ওয়া মিনার রাহমাতে সুমুলেহা ওয়ামিনাল আফিয়াতে হুছুলেহা ওয়া মিনাল আয়েলে আর গাদাহ ওয়া মিনাল ওমরে আছয়াদাহু ওয়া মিনাল এহছানে আতাম্মাহু ওয়া মিনাল এনয়ামে আয়াম্মাহু ওয়া মিনাল ফাদলে আ'যাবাহু ওয়া মিনাল্লুতফে আকরাবাহু ওয়া মিনাল এলমে আলফায়াহু ওয়া মিনাররেযকে আওছায়াহু আল্লাহুম্মা কুনলানা ওয়া লা তাকুন আলাইনা আল্লাহুম্মাখতেস মেনাছ ছাআদাতে আজালানা ওয়া হাক্কেক বেযেয়াদাতে আমালানা ওয়া আকরুন বিল আফিয়াতে গাদায়্যানা ওয়া আছালানা ওয়াজ আল এলা রাহমাতেকা সাছীরানা ওয়া মালানা ওয়াছ বুক বেএছলাও উয়ুবেনা

ওয়াজআলিত্তাক্কওয়া যাদানা ওয়া ফী দীনিকা এজতেহাদানা ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া এ' তামাদানা এলাহানা ছাব্বেতনা আলা নাছজেল এছতেকামাতে ওয়া আয়েযনা মিন মুজিবাতেন্নাদামাতে ইয়াওমাল কিয়ামাতে ওয়া খাফফেফ আন্না ছেকলাল আওয়ারে ওয়ার যূকনা ঈশাতাল আখরারে ওয়াকফেনা ওয়াছরেফ আন্না শাররার আশরারে ওয়াতেক রেকাবানা ওয়া রেকাবা আবায়েনা ওয়া উম্মাছাতেনা মেনান্নারে ওয়াদ্দাইনে ইয়া আযীযু ইয়া গাফফারু ইয়া কারীমু ইয়া সাত্তারু ইয়া হালীমু ইয়া জাববারু বেরাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহিমীন ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরে খালকিহী মুহাম্মেদেও ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাঈন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

বঙ্গানুবাদঃ হে মা'বুদ। আমি আপনার দরবারে পরিপূর্ণ নেয়ামতের আকাঙ্খা করিতেছি, এবং স্থায়ী পবিত্রতা সুবিস্তৃত কৃপা, পুরষ্কার জীবনের তৃপ্তি, ভাগ্যবান জীবন, পূর্ণ হিতৈষণা, প্রসারিত দান, করুণা ও কোমলতা মুফীদ এলেম এবং প্রশস্ত রুজী ও প্রভু আমি আপনার দরবারে কামনা করিতেছি।

হে মহামহিম প্রভু! আপনি আমার কল্যাণ ও মঙ্গল নসীব করুণ এবং অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। হে খোদা আমাকে খাতেমা বিল খাইর হওয়ার নসীব দান করুন, আপনার কাছে আমার আশা আকাঙ্খার মাত্রা বৃদ্ধি করে দিন, আমার স্বাস্থ্য প্রভাতে ও সন্ধ্যায় উত্তম রাখুন। আমার আশা ও ভরসা আপনার কৃপা ও করুণার প্রতি অটুট রাখুন। আপনার ক্ষমার ডোলচির রশি আমার পাপের উপর বাড়িয়ে দিন। আমার দোষত্রুটিগুলো সংশোধন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করুণ। ধর্মভীরুতা আমার সম্বল করুণ আমার সব চেষ্টা সাধনা পরিশ্রম আপনার দ্বীনের জন্য মশগুল করে দিন। আমার ভরসা ও বিশ্বাস আপনার উপরই বহাল রাখুন।

হে আমার মাবুদ! আমাকে সোজা রাস্তার উপরে কায়েম রাখুন রোজকিয়ামতে লজ্জা পাওয়ার কারণগুলো থেকে আমাকে নিরাপদ রাখুন। আমার উপর থেকে গুনাহের বোঝা হালকা করে দিন। ও আমাকে পুণ্যবানদের জীবন প্রদান করুণ। হে প্রভু। আপনিই আমার জন্য যথেষ্ট ও যথাসর্বস্ব হয়ে যান।

ক্ষতিকারকদের ক্ষতি থেকে আমাকে রক্ষা করুণ। আমাকে আমার বাপ-মা ও দাদা-দাদীকে দোজখের আগুণ,ঋণ ও জুলুমের আপদ থেকে মুক্ত রাখুন।

ওহে সর্বশ্রেষ্ঠদাতা, ওহে সর্বপ্রধান প্রভাবশালী। ওহে সর্বপ্রধান দোষ আচ্ছাদনকারী, ওহে সর্বসেরা ধৈর্য্যশীল, ওহে প্রায় বিনষ্ট কার্য্যগুলির আঞ্জামকারী। আপনার কৃপাগুণে আমার আশা আকাঙ্খাগুলো পূর্ণ করুণ। হে সর্বাধিক কৃপা ও করুণার অধিপতি। আপনার পূর্ণ কৃপা ও করুণার ধারা বর্ষিত হোক আমার সৃষ্টিকুলের সেরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) এর উপরে তাঁর সন্তান-সন্ততির উপরে এবং সমগ্র সাহাবায়ে কেরামদের উপরে। সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি শুধু সে আল্লাহতায়ালারই জন্য যিনি সারা জাহানের মহান প্রতিপালক।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর শৈশবের একটি বিস্ময়কর ঘটনা

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) যখন শৈশবে মকতবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করছিলেন তখনকার একটি বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, তিনি নাকি প্রতিদিন মকতবে হাজির হতে অনেক দেরী হয়ে যেত, প্রতিদিন এভাবে দেরীতে আসার কারণে তাঁহার ওস্তাদজী খুব রাগ করতেন কিন্তু গাজ্জালী অত্যাধিক ভাল ছাত্র হওয়ার দরুণ ওস্তাদজী তাঁহাকে অনেক বেশী স্নেহ করতেন। একদি ওস্তাদজী গাজ্জালীকে রাগ করে বললেন দেখ গাজ্জালী তুমি রোজ রোজ দেরীতে এসে পড়া লেখার অনেক ত্রুটি করছ ভবিষ্যতে ঐরূপ দেরীতে আসলে আর তোমাকে ক্ষমা করা হবেনা, রীতিমত তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

পরের দিন শিশু গাজ্জালী যথারীতি আমার কাঝ থেকে সকাল বেলার খানা খুব তাড়াতাড়ী খেয়ে নিদ্ধারিত সময়ের অনেক আগেই মাদ্রাসায় রওনা হলেন, কিন্তু আজও তিনি পড়া শুরু হওয়ার অনেক পরে ক্লাসে গিয়ে পৌছলেন। ওস্তাদজী রাগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন দেখ বেটা; আজ তোমার রক্ষা নেই তোমাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। শিশু গাজ্জালী কেঁদে কেঁদে বললেন ওস্তাদজী ! আমি তো সকাল সকাল রওনা হয়ে সময় মত আসবার চেষ্টা করি কিন্তু আমি তো তাড়াতাড়ি পথ চলতে পারছিনা, ওস্তাদজী

বললেন কি হয়েছে তোমার, কেন পারচনা বল দেখি।

ওস্তাদজীর অতীব স্নেহের গাজ্জালী নীচু দৃষ্টিতে বিনয় কণ্ঠে উত্তর করলেন মোহ্‌তারাম ওস্তাদজী। আমি যখন ঘর হতে বের হই তখনই দেখ্‌তে পাই চলার পথে রাস্তার মাঝখানে অসংখ্য সোনালী রংএর ছোট ছোট পাখী পাখা বিস্তার করে বসে থাকে আমি ওদেরকে সরিয়ে সরিয়ে আস্তে আস্তে চল্‌তে থাকি ফলে ক্লাশে সময় মত পৌছতে আমার দেরী হযে যায়। এখন বলুন আমি কি করব !

ওস্তাদজী বালক গাজ্জালীর এহেন বক্তব্য শুনে অবাক হয়ে গেলেন। মুহুর্ত্যের মধ্যে তাঁহার রাগের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, হায়-রে প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) হাদীছ শরীফে যে ফরমাইয়াছেন, এলেম তলব করার জন্য তালেবে এলেম যখন রাস্তায় বের হয় তখন তার সম্মানার্থে নূরের ফেরেশতারা তাদের পালক বিছাইয়া দেয়। এ পবিত্র হাদীছ তো আমি জীবনে বহুবার হাদীছ গ্রন্থ সমূহে পড়েছি এবং পাড়ায়েছি, কিন্তু কখনো তো উহার চাক্ষুশ প্রমাণ দেখতে পাইনি। আজ আমার কী অপূর্ব সৌভাগ্য এই ক্ষুদ্র শিশুর মাধ্যমে মহান রাব্বুল আলা মীন আমাকে প্রিয় নবীজির সেই হাদীছের মর্ম যথার্ত ভাবে অনুধাবনের সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই ভবিষ্যতের উম্মতের ভাগ্যাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে উদিয়মান এই শিশু গাজ্জালীর ওস্তাদ হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এই কথা চিন্তা করে শ্রদ্ধেয় ওস্তাদজী অশ্রুশিক্ত নয়নে আবেগ আপ্লুত হৃদয়ে শিশু গাজ্জালীকে স্বস্নেহে বুকে তুলে নিয়ে আল্লাহ পাকের হাজারে শুকরিয়া আদায় করলেন তাঁর ভবিষ্যত উন্নতীর জন্য পরওয়ার দেগারে আলমের দরবারে অসংখ্য দোয়া করলেন।

(আমি এই ঘটনা কোন কোন ওস্তাদের মুখে শুনে লিপিবদ্ধ করলোম। বাকী আল্লাহ পাকই সব চেয়ে ভাল জানেন) "গ্রন্থকার'

 সমাপ্ত